২০০৩

পাক্ষিক

আহমদী

নব পর্যায় ৬৬ বর্ষ ☐ ১১ তম সংখ্যা

১৫ ডিসেম্বর, ২০০৩ ঈসাব্দ

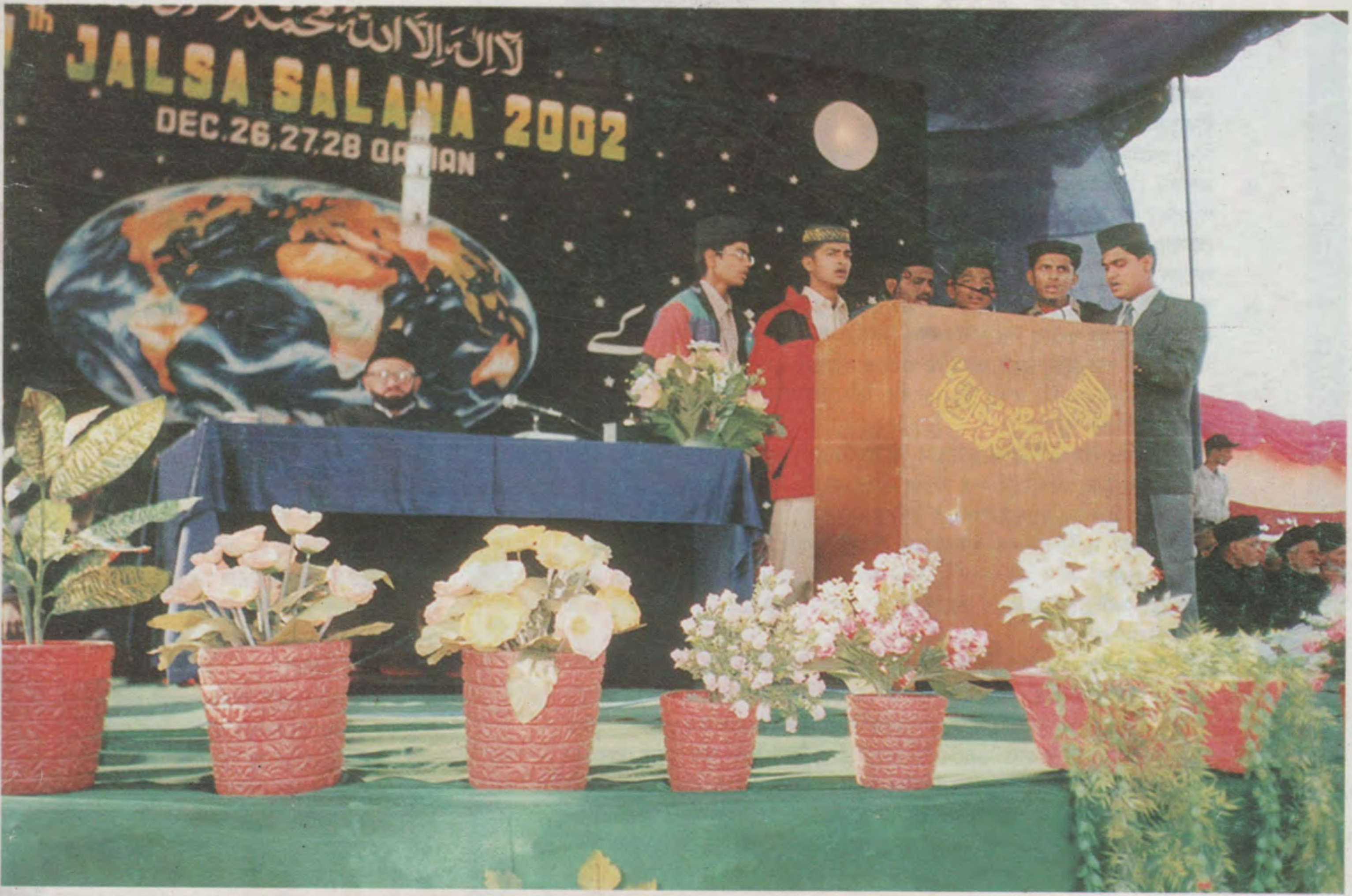
JALSA SALANA 2002
DEC.26,27,28 QA IAN

JALSA SALANA 2002
DEC.26,27,28 QA IAN

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আপনার সন্ধানে আছি!

হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ,
খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)

১. আপনি কি পরিশ্রম করতে জানেন? এইরূপ পরিশ্রম যে, তের-চৌদ্দ ঘন্টা পর্যন্ত প্রত্যহ কাজ করতে পারেন?

২. আপনি কি সত্য কথা বলতে জানেন; এইরূপ সত্য কথা যে কোন অবস্থাতেই মিথ্যা কথা বলেন না; এমন কি আপনার অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং প্রিয়জনও আপনার সম্মুখে মিথ্যা কথা বলতে সাহস করে না এবং কেউ আপনার সম্মুখে নিজের মিথ্যা বীরত্বমূলক কেচ্ছা শুনালে আপনি তার প্রতি নিন্দা প্রকাশ না করে থাকতে পারেন না?

৩. আপনি কি মিথ্যা সম্মানের লালসা হতে মুক্ত? মহল্লার গলি ঝাড়ু দিতে পারেন? বোঝা বহন করে ঘুরে বেড়াতে পারেন? বাজারে উচ্চস্বরে সর্বপ্রকার ঘোষণা করতে পারেন? সমস্ত দিন চলতে এবং সমস্ত রাত জাগ্রত থাকতে পারেন?

৪. আপনি ই'তেকাফ করতে পারেন? এইরূপ ই'তেকাফ যে–
   ক) এক স্থানে ঘন্টার পর ঘন্টা এবং দিনের পর দিন থাকতে পারেন;
   খ) ঘন্টার পর ঘন্টা বসে তসবীহ করতে পারেন এবং
   গ) ঘন্টার পর ঘন্টা এবং দিনের পর দিন কোন মানুষের সঙ্গে বাক্যালাপ ছাড়াই থাকতে পারেন।

৫. আপনি কি শত্রু ও বিরুদ্ধাচারীগণ পরিবেষ্টিত অজানা ও অচেনাগণের মধ্যে দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ এবং মাসের পর মাস স্বীয় বোঝা বহন করে একা কপর্দকহীনভাবে সফর করতে পারেন?

৬. কোন কোন ব্যক্তি সকল পরাজয়ের উর্ধ্বে থাকে, তারা পরাজয়ের নামও শুনতে পসন্দ করে না। তারা পাহাড়-পর্বত কাটতে তৎপর হয় এবং নদীগুলোকে টেনে আনতে উদ্যত হয়ে পড়ে। আপনি কি এ রকম কাজ করতে সদা প্রস্তুত?

৭. আপনার এইরূপ মনোবল আছে কি যে, সমস্ত জগৎ বলবে ভুল– আর আপনি বলবেন শুদ্ধ। চারদিক হতে লোকেরা ঠাট্টা করবে কিন্তু আপনি গাম্ভীর্য বজায় রাখবেন। লোক আপনার পশ্চাদ্ধাবন করে বলবে : 'দাঁড়াও, আমরা তোমাকে প্রহার করবো'। তখন আপনার পদযুগল দ্রুত ধাবমান হওয়ার পরিবর্তে দাঁড়িয়ে পড়বে এবং আপনি মাথা পেতে বলবেন : 'এসো প্রহার কর'। আপনি তাদের কারো কথা মানবেন না। কেননা, তারা মিথ্যা বলে; কিন্তু আপনি সকলকে আপনার কথা স্বীকার করতে বাধ্য করবেন। কেননা, আপনি সত্যবাদী।

৮. আপনি এই কথা বলবেন না যে, আপনি পরিশ্রম করেছেন, কিন্তু খোদাতাআলা আপনাকে অকৃতকার্য করেছেন। বরং আপনি প্রত্যেক অকৃতকার্যতাকে নিজের দোষের ফলশ্রুতি বলে মনে করুন। আপনি ইহা বিশ্বাস করেন যে, যে পরিশ্রম করে সে-ই কৃতকার্য হয়। যে কৃতকার্য হয় নি, সে আদৌ পরিশ্রম করে নি।

আপনি যদি এইরূপ হয়ে থাকেন তাহলে আপনি একজন উত্তম মোবাল্লেগ এবং ভাল ব্যবসায়ী হওয়ার যোগ্যতার অধিকারী। কিন্তু আপনি আছেন কোথায়? খোদার বান্দা অনেক দিন হতে আপনার অনুসন্ধান করছেন। হে আহমদী যুবক! সেই ব্যক্তির সন্ধান কর নিজ দেশে, নিজ নগরে, নিজ মহল্লায়, নিজ গৃহে, অনুসন্ধান কর নিজ অন্তরে। কেননা, ইসলামের বৃক্ষটি শুষ্ক হতে চলেছে, রক্ত সিঞ্চনে উহা পুনরায় সজীব হবে।

আহমদীয়তের বিশ্বায়ণ

আহমদীয়া মুসলিম জামাত রসূলুল্লাহ্ (সঃ) কর্তৃক প্রতিশ্রুত হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে।

আল্লাহ্তাআলার চিরায়ত বিধান মোতাবেক বিরোধিতার উত্তাল তরঙ্গ পার হয়ে আসতে হয়েছে একে। শতাধিক বছর আগে কাদিয়ানের এক ক্ষুদ্র পল্লী থেকে যে ঐশী আহ্বান উচ্চকিত হয়েছিলো আজ তা সারা বিশ্বের ৫টি মহাদেশে ১৭৬টিরও অধিক দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। ইন্টারন্যাশনাল হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহ্দী তাঁর আল্ ওসীয়্যত পুস্তকে ওয়াদা করেছিলেন সেই প্রতিশ্রুতি মোতাবেক আহমদীয়ত বৃক্ষটি চতুর্দিকে এর ডাল-পালা মেলে ফুলে-ফলে সুশোভিত হয়ে চলেছে। কোন পার্থিব বাধা-বিপত্তি এর অগ্রযাত্রাকে রুখতে পারে নি। আর ইনশাআল্লাহুল আযীয পারবেও না।

বর্তমান বাংলাদেশে এ জামাতের সদস্যদেরকে রোযার মাসে অবরুদ্ধ করা হচ্ছে, রোযা থাকা অবস্থায় একজনকে শহীদ করা হয়েছে, সর্বোপরি এ জামাত তথা 'কাদিয়ানীদেরকে অমুসলমান ঘোষণা' করার দাবী উঠেছে। জামাতের সদস্যদেরকে ভয়-ভীতি দেখানো হচ্ছে ও বিভিন্নভাবে নির্যাতন করা হচ্ছে।

যারা এ আন্দোলনের প্রবক্তা তারা কি এটা ভেবে দেখেন না যে, আহমদীয়া জামাতকে বাংলাদেশ অমুসলমান ঘোষণা করলে বা যুক্তির খাতিরে সারা দেশের আহমদীদেরকে তাদের প্রিয় জন্মভূমি থেকে বিতাড়িত করলে বা নিধন করে ফেল্লে কি দুনিয়া থেকে আহমদীয়তকে মিটিয়ে ফেলতে পারবেন? পাকিস্তানের কথাই ধরুন না। জেনারেল জিয়াউল হক আহমদীয়তকে 'ক্যান্সার' আখ্যা দিয়ে দুনিয়া থেকে মিটিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু খোদার কী আশ্চর্য লীলা! জেনারেল সাহেব নিজেই নীল আকাশে ধ্বংস হয়ে গেছেন। এভাবে অতীতে যে অশুভ শক্তিই আহমদীয়তের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে মহান আল্লাহ্তাআলা সেই মস্তককেই চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছেন।

ধর্মজগতে বিরোধিতা একটি স্বতঃসিদ্ধ প্রক্রিয়া। এর মাধ্যমে ঐশী জামাতের সদস্যরা আল্লাহ্র দিকে বেশি বেশি ঝোঁকে এবং দোয়ায় মগ্ন হয়। কেননা, তারা জানেন আল্লাহ্ ছাড়া তাদের কোন মালিক নেই। নেই কোন মা'বূদও। তাঁর সন্তুষ্টির কারণেই তারা প্রত্যাদিষ্ট পুরুষকে মান্য করে থাকেন এবং আল্লাহ্ তাদেরকে সবসময় রক্ষা করে আসছেন। দুনিয়ার মালিক খোদা। কিন্তু যারা প্রকারান্তরে খোদা বনতে চায় তাদের কাছে তারা কখনও মাথা নত করেন না। ফলে স্বর্গীয় খোদার আত্মাভিমানে বান ডাকে এবং তাঁর রহমতে তোলপাড় সৃষ্টি হয়ে তাঁর বান্দাদেরকে রক্ষা করেন এবং ঐশী জামাতের প্রসার ও বিস্তৃতির ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধি ঘটিয়ে একটি আশ্চর্য লীলা দেখাতে আরম্ভ করেন। কোন ঐশী জামাতের বেলায় এর ব্যতিক্রম হয় নি আর এখনও হবার নয়। সুতরাং বাংলাদেশ জামাতের সদস্যদের কাছে আমার আকুল আবেদন ঃ আপনারা আপনাদের চোখের উত্তপ্ত পানিতে সিজদাগাহ্ সিক্ত করুন আর দেখতে থাকুন পরম করুণার আধার আল্লাহ্ এবার কী আশ্চর্য লীলা দেখান!

মোবাশ্শের উর রহমান
ন্যাশনাল আমীর
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ

পাক্ষিক
আহমদী

নব পর্যায় ৬৬ বর্ষ ॥ ১১ম সংখ্যা

১ পৌষ ১৪১০ বঙ্গাব্দ ২২ শওয়াল ১৪২৪ হিঃ কাঃ
১৫ ফাতাহ ১৩৮২ হিঃ শাঃ ১৫ ডিসেম্বর, ২০০৩ ঈসাব্দ

বার্ষিক চাঁদা ঃ বাংলাদেশ টাঃ ১৫০ ◆ ভারত টাঃ ২০০ ◆ অন্যান্য দেশে L 50/ $ 100

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক
মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ
নির্বাহী সম্পাদক
মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান
বার্তা সম্পাদক
মোহাম্মদ আবদুল জলীল
প্রচার সম্পাদক
মাহবুবুর রহমান

বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি
আব্দুল আউয়াল ইমরান
হিসাব ব্যবস্থাপক
মোহাম্মাদ আব্দুস সাত্তার
বৈদেশিক বিষয়ক উপদেষ্টা
এ. কে. রেজাউল করীম

বিদেশ প্রতিনিধি

মোহাম্মদ আব্দুল হাদী	- লন্ডন, ইউ কে
মোহাম্মদ খলিলুর রহমান	- নিউ ইয়র্ক
মইন উদ্দীন সিরাজী	- ক্যালিফর্নিয়া
ন, ন, মোহাম্মদ সালেক	- কানাডা
আজিজ আহমদ চৌধুরী	- জার্মানী
কাউসার আহমদ	- হল্যান্ড
এন, এ, শামীম আহমদ	- বেলজিয়াম
ইসমত উল্লাহ্	- জাপান
ইঞ্জিনিয়ার শরীফ আহমদ	- নিউজিল্যান্ড
ডাঃ মাহবুবুল ইসলাম	- অষ্ট্রেলিয়া
সৈয়্যদ মোহাম্মদ রেজা শাকিল	- ফ্রান্স

তত্ত্বাবধানে ঃ সেক্রেটারী পাবলিকেশনস্

আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহমদীয়া
আর্ট প্রেস, ৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে
মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
ফোন ঃ ৭৩০০৮০৮, ৭৩০০৮৪৯, ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৭৩০০৯২৫
E-mail : amgb@bol-online.com

সম্পাদকীয়

একবার ভেবে দেখবেন কি?

ইদানিং আহমদীয়া মুসলিম জামাতকে অমুসলিম ঘোষণা করার জন্য কোন কোন চিহ্নিত মহল থেকে আবারও সরকারের কাছে দাবী তোলা হচ্ছে। এ প্রেক্ষিতে দেশবাসীর নিকট আমরা কতগুলো বিষয় পুনঃ উত্থাপন করছি ঃ

তারা অনুগ্রহ করে এবার ভেবে দেখবেন। কোন দেশের সরকার নাগরিকদের ধর্ম নিরূপণ করার অধিকার রাখে কি? ধর্ম গ্রহণ ও বর্জন মানুষের অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিগত মৌলিক অধিকার। এ দেশের সরকার এ মৌলিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করলে অন্যান্য দেশের সরকারও মানুষের ধর্মীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে পারে। এ মৌলিক অধিকার কুরআনস্বীকৃত। কুরআনের ভাষায় **লাকুম দীনুকুম ওয়ালিয়াদীন**। কোন সরকার যদি মুসলমানদের অমুসলমান ঘোষণা দেয়ার অধিকার রাখে তবে সেই সরকার নিশ্চিতভাবে অমুসলমানদের মুসলমান ঘোষণা দেয়ারও অধিকার রাখে। বাংলাদেশ সরকার জাতীয় সংসদের কোন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যদি এদেশের হিন্দুদেরকে মুসলমান বলে ঘোষণা দেয় তবে কি তারা সত্যি সত্যিই মুসলমান হয়ে যাবে? এ সরকারী সিদ্ধান্ত কি ধর্ম-জগতের একচ্ছত্র মালিক আল্লাহ্ পাকের কাছেও গৃহীত হবে? উপরোক্ত নীতিতে ভারতে লোকসভা যদি ভারতীয় প্রায় ১৬ কোটি মুসলমানকে হিন্দু বলে গণ্য করার সিদ্ধান্ত নেয় তবে মুসলমানরা সত্যি-সত্যিই কি হিন্দু হয়ে যাবে?

মুসলিম উম্মাহ্র কোন ফিরকা বা সম্প্রদায়কে সরকারী ঘোষণার মাধ্যমে অমুসলিম বানানোর অর্থই হ'ল উক্ত ঘোষণার পূর্ব-মুহূর্ত পর্যন্ত তারা মুসলমান ছিল তা না হলে ঘোষণার কোন অর্থই হয় না। আমাদের প্রশ্ন, বিশ্বাস পরিবর্তন না করেও কেবল 'সরকারী ঘোষণা' কি কারও ধর্ম পরিবর্তন করে দিতে পারে? কুরআন-হাদীস বা অন্যান্য ধর্মের ঐশী গ্রন্থাদিতে এমন কোন্ নির্দেশ বা নজির আছে কি?

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) বলেছেন, আমার উম্মত তিহাত্তর ভাগে বিভক্ত হবে, এদের একটি ছাড়া অবশিষ্ট সবগুলি আগুনের পথের পথিক হবে (তিরমিযী, কিতাবুল ঈমান)। ধর্ম নিরূপণ যদি সরকারী ক্ষমতার আওতাভুক্ত হয়ে থাকে তাহলে সরকারের উচিত প্রথমে খাঁটি মুসলমান ফিরকাটিকে চিহ্নিত করে বাদ বাকী সবগুলোকে অমুসলিম ঘোষণা করা। মৌলবী-মৌলানা সাহেবদের মাঝে যারা আহমদীয়া মুসলিম ফিরকাকে অমুসলিম ঘোষণা করার দাবী তুলেছেন তারা নিজেদের 'মুসলমানিত্বের সার্টিফিকেট, কোন সরকারী ঘোষণার মাধ্যমে লাভ করেছেন কি? না হলে তাদের মুসলমানিত্বের মাপকাঠি কী?

আহমদীগণ পবিত্র কলেমা **লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্**-তে পূর্ণমাত্রায় বিশ্বাসী। এছাড়া নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত তারা যথারীতি পালন করে। তা সত্ত্বেও যদি তাদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করা হয় তাহলে কুরআন হাদীস প্রদত্ত মুসলমানের সংজ্ঞাকেই বদলাতে হবে। সরকার কি মুসলমানের সংজ্ঞাকে পরিবর্তনের ক্ষমতা রাখেন? আল্লাহ্তাআলা প্রত্যেক ব্যক্তিকে যে কোন ধর্ম গ্রহণ বা বর্জনের স্বাধীনতা দান করেছেন। তাই ধর্ম বিষয়ে বিচার করার অধিকার একমাত্র তিনিই রাখেন। সরকার এ অধিকার নিজ হাতে তুলে নিলে আল্লাহ্তাআলা কি সেই সরকারের উপর সন্তুষ্ট হবেন? যে সরকারই এ ধরনের খোদকারী করেছে তারা আস্তকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। ইতিহাস এর জলন্ত সাক্ষী।

সুতরাং যারা আজকে আহমদী মুসলমানদের অমুসলিম বানাবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছেন তাদের কাছে আমাদের নিবেদন, মস্তিষ্ক গরম না করে আহমদী জামাতের প্রতিষ্ঠাতার বই-পুস্তকগুলো মনোযোগ দিয়ে পাঠ করুন। আমরা জানি বিরুদ্ধবাদীরা এগুলো পাঠ না করেই সিদ্ধান্ত নিতে চাচ্ছেন। নইলে বিষয়টি আল্লাহ্র ওপরে ছেড়ে দিন। কেননা, একদিন সকলকে তো তাঁরই সম্মুখে দাঁড়াতে হবে। তাঁর নির্দিষ্ট মানদন্ডে বিচার করা হবে কে মুসলমান আর কে মুসলমান নয়। আহমদীরা যদি অমুসলমান হয়ে থাকে তাহলে তারা আল্লাহ্র শাস্তি থেকে কোন ভাবেই রেহাই পাবে না।

- নির্বাহী সম্পাদক

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
❐ কুরআন মাজীদ ঃ সূরা আল্ আনআম - ৮	ঃ 'কুরআন মাজীদ' থেকে	৩
❐ হাদীস শরীফ ঃ ধৈর্য	ঃ অনুবাদ ও ব্যাখ্যা - মাওলানা সালেহ্ আহমদ	৩
❐ অমৃত বাণী ঃ চশমায়ে মসীহী ঃ হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)	ঃ অনুবাদ - জনাব মোহাম্মদ আজিম উদ্দীন	৪
❐ জুমুআর খুতবা ঃ জলসায় যোগদানকারীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আইঃ)	ঃ অনুবাদ - মাওলানা মুহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী	৫-৯
❐ মসীহ্ (আঃ) হিন্দুস্তান মেঁঃ মূল ঃ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)	ঃ অনুবাদ - মাওলানা আহমদ সাদেক মাহ্মুদ	১০-১১
❐ জুমুআর খুতবা ঃ আমাদের হাতিয়ারই হচ্ছে দোয়া হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আইঃ)	ঃ অনুবাদ - মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ	১২-১৩
❐ মূলাকাৎ ঃ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ)	ঃ সংকলন - আলহাজ্জ নূরুদ্দীন আমজাদ খান চৌধুরী	১৩-১৫
❐ ঐশীবাণী, যুক্তিবাদিতা, জ্ঞান এবং সত্য মূল ঃ হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহেঃ)	ঃ সংক্ষিপ্ত ভাবানুবাদ - অধ্যাপক মোহাম্মদ আমীর হোসেন	১৬-১৭
❐ যাকাত ও আল্লাহ্র পথে ব্যয়	ঃ অনুবাদ - জনাব মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান	১৮-১৯
❐ মু'মিনের বাইর ও ভিতরের অবস্থা এক হতে হয়	ঃ জনাব আমীর মাহ্মুদ ভূঁইয়া	১৯-২১
❐ সিঙ্গাপুরে আহমদীয়ত	ঃঅনুবাদ - ডাঃ শেখ হেলাল উদ্দীন আহমদ	২২-২৩
❐ আল্লাহ্র দায়িত্বে হস্তক্ষেপ করো না!	ঃ প্রচার সম্পাদক, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ	২৪
❐ আহমদীয়া মুসলিম জামাতের পক্ষ থেকে	ঃ প্রচার সম্পাদক, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ	২৫-২৬
❐ ছোটদের পাতা ঃ এসো কুরআন শিখি	ঃ পরিচালক- জনাব মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান	২৭

নতুনদের পাতা ঃ

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
● প্রকৃত মুসলমান কে বা কারা?	ঃ মৌঃ মাহমুদ আহমদ সুমন	২৮-২৯
● কবিতা ঃ শাহ্ আলমের শাহাদত ● শহীদ শাহ্ আলম স্মরণে	ঃ মৌঃ নাসের আহমদ আনসারী ● মৌঃ এনামুল হক রনি	৩০
❐ সংবাদ	ঃ	৩১-৩২

প্রচ্ছদ ঃ দারুল আমান কাদিয়ানের ১১১তম সালানা জলসা ২০০২-এর দৃশ্যাবলী

শহীদ ইস্তিকামতের শক্তি লাভ করে থাকেন

[হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর তত্ত্বপূর্ণ বক্তব্য]

"সাধারণ লোকেরা শহীদের অর্থ কেবল এটাই বুঝে থাকে যে, কোন ব্যক্তি যুদ্ধে নিহত হয়েছেন বা নদীতে ডুবে মারা গিয়েছেন ইত্যাদি। কিন্তু আমি বলি, একে যথেষ্ট মনে করা আর এ পর্যন্ত একে সীমাবদ্ধ রাখা মু'মিনের মর্যাদা থেকে অনেক নীচে। শহীদ আসলে সেই ব্যক্তি হয়ে থাকেন যিনি খোদাতাআলার নিকট থেকে ইস্তিকামত বা স্থৈর্য ও প্রশান্তি লাভ করে থাকেন। আর কোন ভূমিকম্প ও দুর্ঘটনা তাকে পরিবর্তন করতে পারে না। তিনি বালা-মুসিবত ও দুঃখ-কষ্টে বুক পেতে দেন। খোদাতাআলার জন্যে প্রাণ বিসর্জন দিতে হলেও তিনি স্বভাব-বশতঃ এতে বীরত্ব লাভ করে থাকেন আর তিনি কোন প্রকার দুঃখ ও আফসোস ছাড়াই নিজ মস্তক পেতে দেন এবং প্রত্যাশা করেন, ক্রমাগতভাবে যেন তাকে জীবন দেয়া হয় আর তিনি তা আল্লাহ্র পথে বিসর্জন দেন। তার প্রাণে এমন এক প্রকার স্বাদ ও প্রফুল্লতা থাকে যে, তার দেহে তরবারীর প্রত্যেকটি আঘাত ও তার সম্মুখে প্রত্যেক দুঃখ-বেদনা তাকে একটি নব-জীবন, নতুন খুশী এবং সজীবতা দান করে। এ হলো শহীদের অর্থ।

আবার এ শব্দের 'মধু' অর্থ থেকেও এটাই বের হয়। যে-ব্যক্তি কষ্টকর ইবাদত বরদাশ্ত করেন এবং খোদার পথে প্রত্যেক প্রকার তিক্ত ও কষ্টকে সহ্য করেন আর সহ্য করার জন্যে প্রস্তুত হয়ে যান তিনিও মধুর ন্যায় এক প্রকার মিষ্টি ও স্বাদ লাভ করে থাকেন। আর যেভাবে মধুতে এক প্রকার আরোগ্যও রয়েছে (সূরা নাহল ৭০) তার মাঝে এর বিকাশ ঘটে। এসব লোকও এক প্রকার প্রতিষেধকে পরিণত হন। এদের সান্নিধ্যে আগমনকারী বহু প্রকার রোগ-ব্যাধি থেকে মুক্তি লাভ করে থাকেন।

আবার শহীদ সেই মর্যাদা ও পদের নামও যেখানে অবস্থান করে মানুষ তার প্রত্যেক কাজে আল্লাহ্তাআলাকে দেখে থাকে বা কমপক্ষে খোদা দেখেন তাতে দৃঢ়-বিশ্বাসী হয়। এর নাম অনুগ্রহও বটে" (মলফূযাত, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা ২৭৬)।

অনুবাদ - নির্বাহী সম্পাদক

পুস্তক-পুস্তিকা অনুবাদ সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞাতব্য

যেসব বন্ধু হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালামের বা জামাতের কোন পুস্তকের অনুবাদ যে কোন ভাষায় করছেন বা করেছেন আর ওকালতে তসনীফ, লন্ডনকে এর সংবাদ দেয়া হয় নি, তাদের প্রতি আবেদন তারা যেন অনুগ্রহ করে এ প্রসঙ্গে পূর্ণ বিবরণ সত্বর নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট প্রেরণ করেন যেন এ প্রসঙ্গে তাকে কেন্দ্রের দিক-নির্দেশনা দেয়া যেতে পারে।

সম্মতিক্রমে যদি কোন পুস্তকের অনুবাদ করা হতে থাকে তাহলেও অবহিত করুন। যে পত্রের মাধ্যমে সম্মতি দেয়া হয়েছে এর ফটোকপিও পাঠিয়ে বাধিত করুন। ওয়াস্সালাম।

স্বাক্ষরিত-মুনীর উদ্দীন শামস
এডিশনাল ওকীলুত্ তসনীফ
"Islamabad, 2, Sheephatch lane, Tilfórd, Surrey, GUIO 2AQ, UK

পদ-খালি

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ঢাকা-এর অফিসের জন্য একজন হিসাবরক্ষক জরুরী ভিত্তিতে নিয়োগ দেয়া হবে। উক্ত পদে শিক্ষাগত যোগ্যতা ন্যূনতম এইচ, এস, সি পাস সহ ভাল কম্পিউটার জ্ঞান, বাংলা ও ইংরেজীতে টাইপ করার সন্তোষজনক গতি থাকতে হবে।

ইচ্ছুক আহমদী প্রার্থীগণকে স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্টের মাধ্যমে আগামী ৩১/০১/২০০৪ইং তারিখের মধ্যে শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্র ও সত্যায়িত দুই কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি সহ দরখাস্ত ঢাকা অফিসে জমা দেয়ার জন্য বলা হচ্ছে। যোগ্যতম প্রার্থীর বেতন ও ভাতা আলোচনার মাধ্যমে নির্ধারণ করা হবে।

- জুলফিকার হায়দার
জেনারেল সেক্রেটারী
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ঢাকা

কুরআন মাজীদ

সূরা আল্ আনফাল - ৮

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيُثْبِتُوْكَ اَوْ يَقْتُلُوْكَ اَوْ يُخْرِجُوْكَ ۚ وَيَمْكُرُوْنَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ ۖ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ (٣١)

৩১। এবং (স্মরণ কর) যখন কাফিররা তোমার বিরুদ্ধে কৌশল আঁটছিল, যেন তারা তোমাকে অবরুদ্ধ করতে পারে অথবা তোমাকে হত্যা করতে পারে অথবা তোমাকে বের করে দিতে পারে। তারা কৌশল আঁটছিল এবং আল্লাহ্ও কৌশল আঁটছিলেন,[১১১৫] বস্তুত আল্লাহ্ উত্তম কৌশলকারী।

وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا قَالُوْا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَآءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هٰذَآ ۙ اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ (٣٢)

৩২। এবং আমাদের আয়াতসমূহ তাদের কাছে পড়ে শোনানো হলে তারা বলে, আমরাও এ ধরনের কথা বানিয়ে বলতে পারি,[১১১৬] এ যে কেবল পূর্ববর্তীদের গল্প-কাহিনী।

وَاِذْ قَالُوا اللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَاَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَآءِ اَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ (٣٣)

৩৩। এবং (স্মরণ কর) যখন তারা (অর্থাৎ কাফিররা) বলছিল, 'হে আল্লাহ্! তোমার পক্ষ থেকে এটাই সত্য (ধর্ম) হয়ে থাকলে তুমি আকাশ থেকে আমাদের ওপর পাথর বর্ষণ কর অথবা আমাদেরকে অন্য কোন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দাও।'[১১১৭]

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ ۚ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ (٣٤)

৩৪। আর তুমি তাদের মাঝে থাকা অবস্থায় আল্লাহ্ তাদেরকে শাস্তি দিতে পারেন না[১১১৮] এবং তারা ক্ষমা প্রার্থনায় রত থাকা অবস্থায়ও তাদেরকে শাস্তি দিতে পারেন না।

وَمَا لَهُمْ اَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللّٰهُ وَهُمْ يَصُدُّوْنَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوْٓا اَوْلِيَآءَهٗ ۚ اِنْ اَوْلِيَآؤُهٗٓ اِلَّا الْمُتَّقُوْنَ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ (٣٥)

৩৫। এবং তারা মসজিদে হারামের তত্ত্বাবধায়ক না হয়েও যখন তারা এথেকে (লোকদেরকে) বাধা দিচ্ছে সেক্ষেত্রে তাদের এমন কি গুরুত্ব রয়েছে যে, আল্লাহ্ তাদেরকে শাস্তি দিবেন না? কেবল মুত্তাকীরাই এর (প্রকৃত) তত্ত্বাবধায়ক, তবে এদের (অর্থাৎ কাফিরদের) অধিকাংশই জানে না।

১১৫। এ আয়াত মক্কার দারুন্ নদওয়া (পরামর্শ কক্ষ)-তে যে গোপন সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেদিকে ইঙ্গিত করছে। নতুন ধর্মের উন্নতিকে স্তব্ধ করে দেয়ার জন্য তাদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে দেখে এবং অধিকাংশ মুসলমান যাদের পক্ষে মক্কা-ত্যাগ করে যাওয়া সম্ভব ছিল, মদীনায় হিজরতের দরুন ক্ষতি সাধনে নাগালের বাইরে চলে যেতে দেখে শহরের সমাজপতিরা ইসলামকে ধ্বংস করার জন্য শেষ চেষ্টাস্বরূপ পরিকল্পনা গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে দারুন নদ্ওয়াতে একত্র হয়েছিল। গভীর চিন্তা-ভাবনা করার পর তারা এক ষড়যন্ত্রের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো যে, কুরায়েশদের বিভিন্ন গোত্র হতে যুবকদের একটি দল মিলিতভাবে আক্রমণ করে হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর ওপর আকস্মিক ক্ষিপ্রতায় ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁকে হত্যা করবে। গভীর রাত্রে সতর্কভাবে প্রহরারত শত্রুরা যখন তন্দ্রাচ্ছন্ন ছিল রসূলে পাক (সঃ) তখন সকলের অলক্ষ্যে তাঁর সদাবিশ্বস্ত সাহাবী হযরত আবূবকর (রাঃ)-কে সঙ্গে নিয়ে হিজরত করে সওর পর্বতগুহায় আশ্রয় নেন এবং শেষ পর্যন্ত নিরাপদে মদীনায় পৌছে যান।

১১৬। অবিশ্বাসীরা অহংকার করে বলেছিল, কুরআনের মত রচনা তারাও করতে পারে। কিন্তু এটা তাদের একটা ফাঁকা আস্ফালনই থেকে গিয়েছিল, কেননা তারা তা কার্যে পরিণত করে দেখাতে সাহস করে নি। তারা কখনো কুরআনের ক্ষুদ্রতম বা সংক্ষিপ্ততম সূরার মত একটি সূরাও রচনা করতে পারবে না বলে কুরআনের যে চ্যালেঞ্জ তা চির অম্লান হয়েই রয়েছে।

১১৭। বদরের যুদ্ধক্ষেত্রে আবূ জাহল এ আয়াতের কথাগুলোই প্রায় উচ্চারণ করে প্রার্থনা করেছিল (বুখারী কিতাবুত তফসীর)। এ প্রার্থনা আক্ষরিকভাবেই পূর্ণ হয়েছিল। কুরায়শকুলের অন্যান্য অনেক সর্দারসহ আবূ জাহল নিহত হয়েছিল এবং তাদের মৃতদেহগুলোকে খাদে নিক্ষেপ করা হয়েছিল।

১১৮। হযরত নবী করীম (সঃ) মক্কা ত্যাগ করার পর মক্কাবাসীরা শাস্তি পেয়েছিল। আল্লাহ্তাআলার প্রেরিত রসূল ঐশী-বিপর্যয় বা বিপদাবলীর মুখে এক প্রকার ঢালস্বরূপ হয়ে থাকেন।

হাদীস শরীফ

ধৈর্য

"আন আবি ইয়াহ্ইয়া সুহাইবিব্নে সিনানিন রাযিআল্লাহ্ আনহু ক্বালা ক্বালা রসূলুল্লাহি সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামা আযাবান লেআমরিল মু'মিনে ইন্না আমরাহু কুল্লাহু লাহু খায়রুন ওয়া লায়সা যালিকা লি আহাদিন ইল্লা লিলমু'মিনে ইন আসাবাতহু সার্রাউ শাকারা ফাকানা খায়রাল্ লাহু ওয়া ইন আসাবাতহু যাররাউ সাবারা ফাকানা খায়রাল্ লাহু"

অর্থাৎ সুহাইব ইবনে সিনান (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, হযরত রসূল করীম (সঃ) বলেছেন, মু'মিনের ব্যাপারটা অদ্ভুত। তার সমস্ত কাজই কল্যাণকর। মু'মিন ছাড়া অন্যের ব্যাপারে এরূপ নয়। তার জন্য আনন্দের কোন কিছু হলে সে আল্লাহ্র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। আবার ক্ষতির কোন কিছু হলে সে ধৈর্য ধারণ করে। এটাও তার জন্য কল্যাণকর (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্তালা মু'মিনদের নির্দেশ দিয়েছেন, তোমরা ধৈর্যধারণ কর ও পরস্পরকে ধৈর্য ধারণের নসীহত কর (এ অংশের অনুবাদ এ-ও যে, তোমরা মন্দকর্ম পরিহার কর)। ধৈর্য এমন গুণ যা মানুষকে সুশোভিত ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী করে। ধর্মীয় জগতে ধৈর্য আধ্যাত্মিক উন্নতির সোপান। আজ পর্যন্ত যত রসূল ও উম্মত গত হয়েছে তাদের সকলকে এ মানবীয় শক্তির পরীক্ষা দিতে হয়েছে। এর দ্বারা তারা প্রমাণ করেছেন যে, তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের জন্য কতটুকু ত্যাগ ও দৃঢ়তা প্রদর্শন করতে পারে। ধৈর্য ব্যতিরেকে দৃঢ়তা দেখানো কখনও সম্ভব নয়। হযরত মূসা (আঃ)-এর জাতি এ বিষয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারে নি। তাই তাদের বার বার বিভিন্ন বিপদে ও পরীক্ষায় নিপতিত হ'তে হয়েছে। তারা তো এমনই অধৈর্য জাতি ছিল যে, এক পর্যায়ে তারা তাদের নবীকে বলে দিল, 'তুমি ও তোমার খোদা গিয়ে যুদ্ধ কর, আমরা তো এখানেই বসে থাকবো।'

অপর দিকে সারওয়ারে কায়েনাত হযরত মুহাম্মদ (সঃ) মূর্তিমান ধৈর্যের প্রতীক ছিলেন এবং তাঁর (সঃ) উম্মতও তাদের নবী (সঃ)-এর অনুকরণে ধৈর্যের চূড়ান্ত মার্গে উপনীত হয়ে জগতের জন্য আলোর দিশারী হয়েছেন। হযরত বেলাল (রাঃ) মরুপ্রান্তের 'আহাদ' 'আহাদ'-এর আর্তনাদ, আলে ইয়াসিরের গগন বিদারী চিৎকার ও সত্যের উপর অবিচল থাকা এবং প্রিয় নবী (সঃ)-এর উপর অবর্ণনীয় নির্যাতনের জবাবে তাঁর (সঃ) খোদার দরবারে চাপা কান্না ও অবিচল থাকা তাঁকে অতি অল্প সময়ে আরবের বাদশাহ্তে পরিণত করল। আঁ হযরত (সঃ)-এর উপরোক্ত হাদীসটি এরই দিকে ইঙ্গিত করছে। তিনি (সঃ) জানাচ্ছেন, মু'মিনের প্রতিটি কর্ম খোদার জন্য হয়ে থাকে। সুখে সে খোদার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। কষ্ট ও বিপদে সে ধৈর্য ধারণ করে। আর এই দু'অবস্থাতেই খোদা তার জন্য মঙ্গল

রেখেছেন। মু'মিনদের জীবনে ধৈর্যের সবচে' বড় পরীক্ষা আসে তার ঈমানের উপর যখন আক্রমণ হয়। আর সে সময়ে মু'মিন ঈমানের মুকাবেলায় সব কিছুকে তুচ্ছ জ্ঞান করে অবিচল থাকে এবং ধৈর্যের প্রতীক হয়ে যায়।

বর্তমানে বাংলাদেশে আমাদের উপর বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা চলছে। এ পরীক্ষায় আমাদের জান, মালও দিতে হচ্ছে। সাহাবায়ে কেরামও স্বয়ং আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ) নিজ ঈমানে অবিচল থেকে ধৈর্যের পাহাড় হয়ে তাঁর বিরুদ্ধবাদীদের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ইনশাআল্লাহ্, আমরাও আমাদের ঈমানের রক্ষার জন্য প্রিয় নবী (সঃ)-ও সাহাবাদের অনুকরণে তা-ই করব। এমন পরীক্ষা মঙ্গল ও সফলতাই নিয়ে আসে। এমন সকল পরীক্ষা সাময়িক হয়ে থাকে। এবং মু'মিনের উন্নতির কারণ হয়ে থাকে। আমাদের করণীয় আমরা যেন ধৈর্য ও দোয়ার মাধ্যমে এসব পরীক্ষার মোকাবেলা করি। গত ২৮/৯/০৩ তারিখের খুতবাতেও আমাদের প্রিয় খলীফা (আইঃ) এ দিকে জামাতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। আমরা যেন সবাই দোয়ায়রত থাকি এবং দোয়া করে ক্লান্ত না হই। আর এ জন্য ধৈর্যের প্রয়োজন। আল্লাহ্ করুন আমরা যেন ধৈর্যের সাথে দোয়ায় রত থাকি এবং আমাদের খোদা আমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসেন, আমীন।

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা - **মাওলানা সালেহ্ আহমদ**
- মুরব্বী সিলসিলাহ্

অমৃতবাণী

হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)

চশমায়ে মসীহী

(২১তম কিস্তি)

কিন্তু, ইতোপূর্বে আমি উল্লেখ করেছি যে, এ উচ্চতর প্রেম উচ্ছ্বসিত করতে ঐশ্বরিক সৌন্দর্য ও উপকারিতার জ্ঞান উত্তমরূপে অর্জন করা আবশ্যক। খোদাতাআলার ব্যক্তিগত সৌন্দর্য, রূপ ও গুণ অসীম, তাঁর উপকার অসীম, সদা তিনি এত উপকার সাধনে প্রস্তুত যে, তদপেক্ষা অধিকতর উপকার লাভ মানুষের পক্ষে অসম্ভব- এসব কথা তার হৃদয় ফলকে অঙ্কিত থাকা আবশ্যক। খোদাতাআলাকে ধন্যবাদ যে, এ পূর্ণজ্ঞানের উপকরণ মুসলমানগণকে পূর্ণ মাত্রায় প্রদান করা হয়েছে। আমাদেরকে খোদাতাআলার গুণ ও সৌন্দর্য বর্ণনায় লজ্জায় পড়তে হয় না (১) এবং যত সুষমা কল্পনা করা ও মানব হৃদয়ে ধরা সম্ভবপর, তদসমুদয় তাঁর স্বরূপ ও গুণে, সত্তায় ও গুণে বিদ্যমান বলে বিশ্বাস করি। আমরা আর্যসমাজের ন্যায় বলি না যে, তিনি আত্মা ও পরমাণু সৃষ্টি করতে অক্ষম, তিনি এত অনুদার যে, অনন্ত মুক্তি প্রদানে অনিচ্ছুক, তাঁর ওহী ও আকাশবাণীর দ্বার অবরুদ্ধ। তিনি এত কঠিন হৃদয় যে, কারও তওবা কবুল করেন না, এক পাপের নিমিত্ত আত্মাকে কোটি কোটি যোনিতে নিক্ষেপ করেন এবং তওবা কবুল করতে অপারগ। আমরা খ্রীষ্টানদের ন্যায় বলি না, আমাদের খোদা কোন কালে মরে ছিলেন, ইহুদীর হাতে বন্দী হয়েছিলেন, কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন, গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হয়েছিলেন, এক অবলার গর্ভে জন্মেছিলেন, তাঁর আরো সহোদর ভাই ছিল, মানুষের পাপ-ভার কমাবার জন্য তিন দিবস যাবৎ নরকবাসী ছিলেন, আপন দাসগণের পাপের বদলে আপন প্রাণ বিনাশ না করে এবং আপনি তিন দিবস নরক ভোগ না করে আপন দাসগণকে পাপমুক্ত করতে অক্ষম ছিলেন। আমরা খ্রীষ্টানগণের ন্যায় এ-ও বলি না যে, হযরতের পর ওহী ও ইলহাম সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়েছে, খোদাতাআলার সাথে বাক্যালাপের দ্বার অবরুদ্ধ হয়েছে। সূরা ফাহিতাতে খোদাতাআলা আামাদেরকে সকল নবীর বিভিন্ন সম্পদের ওয়ারিস সাব্যস্ত করেছেন ও মুসলমানগণকে শ্রেষ্ঠ জাতি বলেছেন। অতএব যে ঐশ্বরিক সৌন্দর্য ও উপকারিতা প্রেমের উৎপত্তিস্থল এতে সর্বাধিক পরিমাণে বিশ্বাস স্থাপন শুধু আমাদেরই ভাগ্যে পড়েছে। (চলবে)

অনুবাদ - **মোহাম্মদ আজিমউদ্দীন**
চলিতকরণ ও সম্পাদনা - **মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান**

---

(১) কোন খ্রীষ্টান যখন শুনতে পায় যে, তার খোদা কোন কালে তিন দিবস মরা ও প্রাণহীন অবস্থায় পতিত ছিলেন, তখন তার আত্মা তাকে ধিক্কার দেয়। খোদাও কি কখনও মরেন? যিনি একদা মরেছিলেন তিনি যে পুনরায় মরবেন না এরই বা কি ভরসা? এমন খোদা যে বেঁচে আছেন এরই বা কি প্রমাণ? হয়ত তিনি মরে গিয়েছেন, জীবিত মানবগণের প্রতি তাঁর অস্তিত্বের কোনই চিহ্ন দেখা যায় না। যারা তাঁকে খোদা! খোদা! বলে থাকে তিনি তাদেরকে কোনই উত্তর দিতে পারেন না। তিনি কোন অলৌকিক কার্য সাধন করতে পারেন না। অতএব নিশ্চয় জানবেন, তিনি মরে গিয়েছেন, কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগরে খানইয়ার ষ্টিটে তাঁর কবর আছে। আর আর্যসমাজের কথা তাদের আত্মাগণের কোন খোদাই নেই, নিজেরাই অনাদি, অনন্ত ও নিজগুণে আত্মাগণের কোন খোদাই নেই, তারা তো নিজেরাই অনাদি, অনন্ত ও নিজগুণে বিদ্যমান।

তাহের ফাউন্ডেশন

আমাদের প্রাণপ্রিয় বর্তমান খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আইঃ) খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস অতি সম্প্রতি সাইয়্যেদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ)-এর জীবনের বিভিন্ন মহা মূল্যবান কার্যাবলী ও নির্দেশনাবলী / খুতবা আহমদীয়া Archive-এর মাধ্যমে যথাযথভাবে সংরক্ষণ ও প্রচার করণার্থে একটি ব্যাপক পরিকল্পনার ঘোষণা করেছেন।

প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ্য যে, খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাহেঃ)-এর খিলাফতকালীন সময়ের শেষের দিকে এবং খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহেঃ)-এর খিলাফতকালীন সময়ের প্রথম দিকে অর্থাৎ ১৯৬০ইং হইত ১৯৭০ইং সময়কালে আমাদের সকলের একান্ত আপন ও প্রাণপ্রিয় সাহেবযাদা মির্যা তাহের আহমদ সাহেব তদানীন্তন পূর্ব-পাকিস্তানে বেশ কয়েকবার ব্যাপক সফর করেন। এসব সফরকালে তিনি প্রত্যন্ত অঞ্চলের বেশ কিছু জামাতও সফর করেছিলেন। উপরোক্ত সফরকালীন সময়ের কোন ছবি, চিঠি বা অন্য কোন স্মৃতি চিহ্ন যদি কারো কাছে থেকে থাকে তবে এগুলোর ফটোকপি বা মূলকপিটি আমাদের জামাতের আহমদীয়া Archive-এ সংরক্ষণকল্পে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের বরাবরে ৪নং বকশী বাজারস্থ ঢাকা দারুত তবলীগে পাঠানোর জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা গেল। প্রকাশ থাকে যে, ছবি / স্মৃতি চিহ্ন প্রদানকারী ভ্রাতা / ভগ্নীর নাম যথাযথই Archive-এ উল্লেখ করা থাকবে।

এ চিঠি / সার্কুলারের মাধ্যমে আমাদের সকল জামাতের স্থানীয় আমীর / প্রেসিডেন্ট সাহেবানদের দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন সকলের অবগতির জন্য বিষয়টি শুক্রবার জুমুআতে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে এলান করান এবং এতদ্বিষয়ে যথাযথ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

- মোবাশ্‌শের উর রহমান
ন্যাশনাল আমীর

জুমুআর খুতবা

জলসায় যোগদানকারীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য

[সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাস্‌রূর আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আইঃ) কর্তৃক
২৫ জুলাই, ২০০৩ইং তারিখে মসজিদ ফযল লন্ডনে প্রদত্ত]

তাশাহ্হুদ তা'আব্বুয ও সূরা ফাতিহা পাঠ করে হুযূর (আইঃ) বলেন ঃ

আল্লাহ্‌র বড় ফযল এবং কৃপা যে, আজ আহমদীয়া মুসলিম জামাত গ্রেট ব্রিটেনের ৩৭তম বার্ষিক জলসা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আজ আরম্ভ হচ্ছে। আল্লাহ্ করুন, এ জলসা যেন পূর্বের মতই আজ থেকে একশ' বার বছর পূর্বে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) যেমন কাদিয়ানে জলসা আরম্ভ করেছিলেন তেমনই ঐতিহ্যবাহী হয়। আল্লাহ্‌র নামে অনুষ্ঠিত এ জলসা অন্যান্য পার্থিব মেলা বা রং তামাশার মত নয়। এ জলসা অত্যন্ত পবিত্র নিয়্যতে এবং মূল্যবান ফলপ্রসূ জলসা। অতি সামান্য এ ভূমিকার পর আমি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর কয়েকটি উদ্ধৃতি পেশ করছি যেখানে হযরত (আঃ) এ জলসার উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন এবং জলসা করা ও এতে শামিল হওয়ার জন্যও বলেছেন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন ঃ

"এ জলসা এমন তো নয় যে, জাগতিক মেলার মত অযথা এর অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা নিতেই হবে। বরং এ জলসা অত্যন্ত পবিত্র নিয়্যত ও মূল্যবান ফলাফল বহনকারী হতে হবে।" "এ জলসা কোন জাগতিক রং তামাসার জন্য নয়" (মজ্‌মুআ ইশতেহারাত; ১ম খন্ড; পৃঃ ৪৪০-৪৪৩)

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন ঃ

"[ইমাম হযরত (আঃ)-এর] বয়াতের ধারাবাহিক বন্ধনের মাঝে প্রবেশ করার পর বয়াতকারী ব্যক্তির তাঁর সাথে বার বার মূলাকাৎ করা (সাক্ষাৎ) উচিত; কোন বয়াতকারী যদি বার বার ইমামের সাথে মুলাকাতের আগ্রহ না রাখে তাহলে তার বয়াত বরকত বিবর্জিত, সারশূন্য ও কেবল রীতিমাত্র। সর্বা সাধারণের জন্য, প্রকৃতিগত দুর্বলতার কারণে, অথবা শক্তি-সামর্থ্য না থাকার কারণে, অথবা সফরের দূরত্বের কারণে এখানে এসে যথেষ্ট সময় ইমামের সাথে থাকার অথবা বছরে একাধিকবার কষ্ট করে এখানে এসে ইমামের সাক্ষাৎ লাভের সুযোগ হয় না। অধিকাংশ মানুষের অন্তরে এত বেশি আগ্রহ বা উৎসাহ্ও থাকে না যে, তারা মুলাকাতের জন্য অনেক কষ্ট স্বীকার করে অনেক বড় ক্ষয়-ক্ষতি নিজের উপর আরোপ করে এখানে আসবে। এসব কারণে বছরে একবার তিন দিনের জন্য এখানে এমন জলসা অনুষ্ঠান করা সমীচীন মনে হয়েছে যাতে জামাতের সকল আহমদী যারা আন্তরিকতা রাখে, যদি আল্লাহ্ চাহেন, স্বাস্থ্য ও সুযোগ-সুবিধা যাদের আছে তারা সময়মত নির্ধারিত তারিখে এখানে এসে উপস্থিত হবেন" [মজমুআ ইশতেহারাত; ১ম খন্ড; পৃঃ ৩০২]।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) আরো বলেছেন ঃ

"যতদূর সম্ভব, সাধ্যমত চেষ্টা করে, বন্ধুদের কেবল মাত্র আল্লাহ্‌র খাতিরে, তরবিয়তী কথাবার্তা শোনার উদ্দেশ্যে এবং দোয়ায় শামিল হবার জন্য নির্ধারিত তারিখে এখানে চলে আসা উচিত। এ জলসায় এমনসব মূল্যবান হকীকত ও মা'রেফাতের কথা শোনানো হবে যা ঈমান, ইয়াকীন এবং মা'রেফতকে বাড়ানোর জন্য আবশ্যক। তাছাড়া এসব বন্ধুর জন্য দোয়াও করা হবে, বিশেষ মনোযোগ সহকারে দোয়া করা হবে। আরহামুর রাহেমীন (সবচেয়ে বড় দয়ালু)-এর দরবারে চেষ্টা করা হবে আল্লাহ্ যেন এদেরকে নিজের কাছে টেনে নেন এবং এদেরকে নিজ বান্দা হিসেবে কবুল করেন এবং এদের মাঝে পবিত্র পরিবর্তন সাধন করেন। একটি সাময়িক উপকার এটাও তারা লাভ করবেন যে, প্রতি বছর যেসব নতুন নতুন ভাই জামাতে শামিল হয়েছেন নির্ধারিত তারিখে এখানে এসে তাদের সাথে দেখা করবেন। তাদের মুখ দেখে নিবেন, পরিচিত হবেন এবং পরস্পরের সাথে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের উন্নতি হয়ে ভালবাসা বৃদ্ধি পেতে থাকবে। ... এ আধ্যাত্মিক জলসায় আরো অনেক রূহানী উপকার লাভ হবে যা ইনশাআল্লাহুল কাদীর সময়ে সময়ে প্রকাশ পেতে থাকবে" [ইশতেহার, ৩০শে ডিসেম্বর, ১৮৯১ইং রূহানী খাযায়েন, ৪র্থ খন্ড; পৃঃ ৩৫২]

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) আরো বলেছেন ঃ

"এ জলসার নিশ্চয় আরো কিছু বরকতময় উদ্দেশ্য থাকবে। প্রত্যেক ব্যক্তি যে যাতায়াত খরচ ইত্যাদি বহন করার সামর্থ্য রাখে সে যেন অবশ্যই এ জলসায় আসে এবং শীতের বিছানা, লেপ বা কম্বল ইত্যাদি যা যা প্রয়োজনীয় তা যেন সঙ্গে নিয়ে আসে। আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের রাস্তায় ছোট ছোট বাধা-বিপত্তিকে যেন গুরুত্ব না দেয়" [ইশতেহার, ৭ ডিসেম্বর ১৮৯২ইং মজমুআ ইশতেহার; ১ম খন্ড; পৃঃ ৩৪১]

হুযূর (আঃ) বলেছেন ঃ

"... যাদের (আর্থিক) সংগতি স্বল্প তাদের জন্য সমীচীন হবে তারা যেন অনেক আগ থেকেই জলসায় উপস্থিত হবার জন্য চিন্তা-ভাবনা করতে থাকে। বিভিন্ন পরিকল্পনা ও মিতব্যয়িতা বা কম খরচ করে করে সামান্য সামান্য টাকা যেন প্রতিদিন বা প্রতিমাসে জমাতে থাকে। পৃথক করে রাখতে থাকে যেন যথাসময়ে টাকার সমস্যা না হয় এবং এ সফর যেন বিনা খরচেই সফল হয়ে যায়" (মজ্‌মুআ ইশতেহারাত; ১ম খন্ড; (লন্ডনে প্রকাশ) পৃঃ ৩০২-৩০৩)

হযরত (আঃ) আরো বলেছেনঃ "মানুষ এখনও আমাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত নয় যে, আমরা কি চাই যেন তারা সেরকম হয়ে যায়। আমরা যা চাই, যে উদ্দেশ্যে

আল্লাহ্ আমাদেরকে আবির্ভূত করেছেন, তা পূর্ণ হওয়া সম্ভব নয় যদি মানুষ বার বার এখানে (ইমাম-আঃ)-এর সান্নিধ্যে না আসে এবং এখানে আসতে যেন বিরক্তিবোধ না করে।"

আরো বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি মনে করে যে, এখানে আসতে গেলে তার উপর বোঝা হয়ে যায়; অথবা সে যদি মনে করে যে, এখানে এসে অবস্থান করলে আমাদের উপর বোঝা হবে- তার ভয় পাওয়া উচিত যে, সে শির্‌ক এর মাঝে আছে। আমাদের ধর্ম-বিশ্বাস এই যে, 'পৃথিবীর সকলেই যদি আমাদের পরিবারের সদস্য হয়ে যায়, তবুও আল্লাহ্তাআলা আমাদের সমস্ত দায়-দায়িত্বের ভার বহন করবেন। আমাদের উপর সামান্যও বোঝা পড়বে না। বন্ধুদের আগমনে তো আমরা বড় আনন্দ বোধ করি। এটি একটি সন্দেহ যা অন্তর থেকে বের করে ফেলা উচিত। আমি কোন লোককে বলতে শুনেছি, 'আমরা এখানে বসে বসে হুযূর (আঃ)-কে কেন কষ্ট দেব? আমরা তো অপদার্থ! এমনেই বসে বসে রুটি খেয়ে যাব?' তারা যেন স্মরণ রাখে, এটি একটি শয়তানী প্ররোচনা, শয়তান তাদের অন্তরে প্রবেশ করিয়েছে যেন তাদের পা এখানে থেমে না যায়' [মুলফূযাত; ১ম খন্ড; পৃঃ ৪৫৫]

আল্লাহ্‌র প্রশংসা করছি। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর প্রতিষ্ঠিত এ জামাত, প্রিয় জামাত সেই ভালবাসার কারণে সেই তা'লীম ও তরবিয়তের কারণে যা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) আমাদেরকে দিয়েছেন, জামাতের লোকেরা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর আহবানে সাড়া দিয়ে আন্তরিকতা ও আগ্রহের সাথে এ জলসায় হাজির হবার জন্য ব্যাকুল হয়ে থাকেন। যেখানে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ অবস্থান করেন সেখানে তো আরো বেশি আগ্রহ নিয়ে অবশ্যই হাজির হতে চান। প্রবল আবেগ নিয়ে বড় বড় আর্থিক ব্যয় বহন করেও আসতে চান। কিন্তু বিভিন্ন পরিস্থিতির কারণে বিরাট আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও লক্ষ লক্ষ কোটি কেটি আহমদী আছেন যারা আসতে পারেন না, আকাঙ্ক্ষাকে চেপে রেখে বসে আছেন তারা। আল্লাহ্‌র অপার অনুগ্রহ যে, এম,টি,এ-র বদৌলতে পৃথিবীর দূর- দূরান্তে নিজ ঘরে বসেই জলসা উপভোগ করছে, জলসায় শামিল হচ্ছেন। 'শুকুর আল্ হামদুলিল্লাহ্'র সাথে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ)-এর জন্য দোয়া বেরিয়ে আসে, যিনি এম,টি,এর এ নেয়ামত লাভের জন্য বড়ই চেষ্টা করেছিলেন এবং সাফল্য লাভ করছিলেন। আল্লাহ্ ও রসূলের এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর কারণে খিলাফতের জন্য জামাতের এ আবেগ ও ভালবাসাকে আল্লাহ্তাআলা যেন চিরদিন কায়েম রাখেন এবং এতে যেন প্রবৃদ্ধি ঘটতে থাকে, স্বল্পতা না আসে কখনও। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এ জলসার জন্য দোয়া করেছেন এবং আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছেন যেন এ জলসা আল্লাহ্‌র স্মরণে হয়। এ জলসায় যেন আধ্যাত্মিক উন্নতি, ধর্মীয় জ্ঞানের উন্নতি হয় এবং তরবিয়তের বিষয়াদির প্রতি দৃষ্টি দেয়া হয়।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) যেমন বলেছেন, এ জলসার একটি বড় উদ্দেশ্য হবে পরস্পরের মাঝে ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন দৃঢ় হওয়া, ভালবাসা বৃদ্ধি পাওয়া; একে অপরের প্রতি দৃষ্টি রাখা; অপর এক ভাইয়ের খাতিরে প্রয়োজনে নিজের অধিকারকে ছেড়ে দেয়ার মত সৎসাহস অর্জন করা, পরস্পরের মধ্যকার ভ্রাতৃত্ব ও ভালবাসাকে বাড়ানোর এটি একটি ভাল সুযোগ। গত জুমুআর খুতবায় আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম যে, মেহমান ও মেযবান উভয় পক্ষই যেন শুভেচ্ছা ভরা আচরণ করে, সুন্দর আচরণ করে। খুশী ও আনন্দ ভরা পরিবেশ যেন বিরাজ করে এবং পরিবেশকে আরো বেশি সুখকর করার চেষ্টা করা প্রয়োজন। সর্বক্ষেত্রে যেন এর প্রকাশ ঘটে। একে অপরের সুখ-দুঃখের প্রতি নজর দেয়া প্রয়োজন। বেশি বেশি সহ্য ও ধৈর্যের পরিচয় দিতে হবে। আল্লাহ্ করুন এ লক্ষ্য-মাত্রা যেন অর্জিত হয়। কিন্তু কীভাবে এ লক্ষ্য-মাত্রা অর্জন হবে? কীভাবে একে অপরের জন্য ত্যাগ স্বীকার করবেন? এ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর লেখা থেকে উদ্ধৃতি পড়ে শোনাচ্ছি। হযরত (আঃ) বলেছেন, "... আমি সত্যিই সত্যিই বলছি, মানুষের ঈমান কখনও সঠিক হতে পারে না যতক্ষণ না সে নিজের আরামের উপর নিজ ভাইয়ের আরামকে প্রাধান্য দেয়। যদি আমার এক ভাই আমার সামনে অসুস্থ এবং দুর্বল হয়েও নীচে শয়ন করে আর আমি সুস্থ স্বাস্থ্যবান হয়েও চৌকির উপর স্থান দখল করি যেন সেই দুর্বল ভাই চৌকির উপর বসতে না পারে; যদি ভালবাসা, সমবেদনা সহকারে এ চৌকি*সেই ভাইকে না দেই এবং নিজে নীচে মেঝের উপর বিছানা না করি তাহলে আমার এমন মনোভাবের জন্য দুঃখ প্রকাশ করতে হয়। একভাই অসুস্থ এবং ব্যথায় জর্জরিত নিরুপায়, এমন অবস্থায় যদি আমি যতদূর সম্ভব চেষ্টা-তদবীর করে সাধ্যমত তার আরামের চেষ্টা না করি এবং আমি আরামে ঘুমিয়ে থাকি তাহলে আমার জন্য দুঃখের বিষয়। আমার এক ধর্মের ভাই (জামাতের ভাই) তার স্বভাবগত কারণে আমার সাথে কিছু কঠিন বাক্য বলে ফেলেছে এবং আমি জেনে-বুঝেও তার সাথে কঠোরতা প্রদর্শন করি তাহলে আমার এ অবস্থা দুঃখজনক। বরং তার কথা শুনে আমার উচিত, আমি যেন ধৈর্য ধারণ করি এবং নামাযের মাঝে তার জন্য কেঁদে কেঁদে দোয়া করি। কারণ সে তো আমার ভাই এবং আধ্যাত্মিকভাবে অসুস্থ। আমার যদি কোন ভাই সাদা-সিদা হয়, অল্প জ্ঞান রাখে, অথবা সরলতার কারণে কোন ত্রুটি করে বসে তাহলে আমার তাকে ঠাট্টা করা অথবা ভ্রুকুঞ্চিত করে তার প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করা অথবা অসৎ উদ্দেশ্যে তার দুর্বলতাকে অন্যদের মাঝে তুলে ধরা উচিত নয়। এ সমস্ত পথ ধ্বংসের। কেউ খাঁটি মু'মিন হয় না যদি তার অন্তর কোমল না হয় নিজেকে সবচে' কম সম্মানের পাত্র মনে না করে এবং সমস্ত অন্তরের কপটতাকে দূর না করে। জনগণের সেবক হওয়া নেতৃত্বের পরিচয় বহন করে। গরীবদের সাথে সম্রতার সাথে মাথা নীচু করে কথা বলা 'মকবুলে ইলাহী' (আল্লাহ্‌র প্রিয়) হবার চিহ্ন। মন্দের জবাব পুণ্যের মাধ্যমে দেয়া সৌভাগ্যের চিহ্ন। ক্রোধকে গিলে ফেলা, কটু কথাকে হজম করে নেয়া অত্যন্ত বাহাদুরীর কাজ। কিন্তু আমি দেখেছি আমাদের জামাতের অনেকের মাঝে এটা নেই। ..." [শাহাদাতুল কুরআন; রূহানী খাযায়েন, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃঃ ৩৯৫]

আল্লাহ্তাআলা আমাদের সকলকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর উপরোক্ত নসীহতের উপর আমল করার তৌফীক দান করুন। এবার আমি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর ১৯০৩ইং সনের কয়েকটি ইলহামের উল্লেখ করছি যাতে জামাতের

অগ্রগতির শুভ সংবাদ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্তাআলা নিজ কৃপাবশতঃ আমাদের এসব উন্নতি দেখাচ্ছেন এবং আগামীতেও দেখাবেন। প্রত্যেক ইলহাম, প্রত্যেক ভবিষ্যদ্বাণী যথাসময়ে পূর্ণতা লাভ করেছে। এতে আমরা হযরত আকদস মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সত্যতার প্রমাণ পেয়েছি। আগামীতেও এমনই হবে, ইনশাআল্লাহ্। এটা তো আল্লাহ্র তকদীর! এ তকদীর প্রকাশ পাবেই পাবে, ইনশাআল্লাহ্। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) -এর খোদ্দামদের (সেবকবৃন্দ) হাতে সারা পৃথিবীতে ইসলামের বিজয় হবেই হবে। অতএব এ সমস্ত শুভ সংবাদের সাথে সাথে নিজেদের প্রতিজ্ঞাকে দৃঢ় করুন। অনেক বেশি দোয়া করতে থাকুন। আমাদের উপর এটি একটি ভারী দায়িত্ব ও কর্তব্য।

জানুয়ারী ১৯০৩ইং এর একটি ইলহাম। হযরত (আঃ) বলছেন, "একটি হালকা স্বপ্ন; কাশ্ফ আকারে আমাকে দেখানো হলো। আমি দেখি, "আমি মহামূল্যবান পোশাক পরিহিত, চেহারা যেন চমকাচ্ছে। এরপর কাশ্ফের অবস্থা ওহীর আকারে পরিবর্তিত হয়ে গেল এবং যে সমস্ত বাক্য ওহী আকারে আমার উপর নাযেল হয়েছে, উক্ত কাশ্ফের কিছু পূর্বে এবং কিছু পরেও নাযেল হয়েছে- নীচে লিখছি সেগুলো এই ঃ

"ইউবদি লাকার রাহমানু শায়য়ান ... (অনুবাদঃ) আল্লাহ্ রহমান, যিনি তোমার সত্যতা প্রকাশের জন্য কিছু করে দেখাবেন খোদার আদেশ আসছে। তুমি তাড়াতাড়ি কর না, এটি একটি শুভ সংবাদ যা নবীগণকে দেয়া হয়" তখন সকাল ৫টা বাজে। ১লা জানুয়ারী ১৯০৩ইং; মোতাবেক ১লা শওয়াল; ১৩২০ হিজরী। ঈদের দিন যখন আমার খোদা আমাকে এ শুভ সংবাদ দিয়েছেন" (তাযকিরাহ্ ঃ পৃঃ ৪৪৮)।

তারপর সেই জানুয়ারী মাসেরই আর একটি ইলহাম ঃ (অনুবাদ ঃ) "আমার কাছে এসেছেন, আয়েল। আয়েল অর্থ জীব্রাইল- সুসংবাদ বহনকারী ফিরিশ্তা। তিনি নির্বাচন করে নিয়েছেন তোমাকে। তিনি আঙ্গুলে চক্কর দিয়ে ইশারা করে বললেন, 'খোদা তোমাকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করবেন। এবং তার উপর ভেঙ্গে পড়বেন, যে তোমার প্রতি উত্তেজিত হবে" হযরত (আঃ) এখানে ব্যাখ্যা করেছেন যে, "আয়েল, মূলতঃ আ ইয়ালাত থেকে উদ্ভুত, অর্থাৎ সংশোধনকারী। যে জালেমের হাত থেকে জুলুম-আক্রান্তকে রক্ষা করে। তাই এখানে জিব্রাইল না বলে আয়েল বলা হয়েছে। এ শব্দের হিকমত এই যে, জালেমের হাত থেকে জুলুম-আক্রান্ত ব্যক্তিকে রক্ষা করবে। এজন্য এই ফিরিশ্তার নাম 'আয়েল' বলা হয়েছে। তারপর সেই ফিরিশ্তার হাতের ইশারা করে দেখিয়েছেন, চারিদিকে শত্রুরা আছে। এবং বলেছে, "ইয়াসিমুকা আল্লাহো মিনাল আদায়ে" আল্লাহ্ তোমাকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করবেন।

এটিও পূর্বের ইলহামের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ (অনুবাদ) ঃ "তিনি করীম (বড় মহান, দয়ালু, দানশীল) তোমার সামনে তোমার আগে আগে চলেছে; যে তোমার শত্রু, তিনি তার শত্রু হবেন।" আয়েল শব্দ সম্ভবতঃ অভিধানে পাওয়া যাবে না, অথবা এর ব্যবহার খুব কম হয়েছে, তাই ইলহামের মাধ্যমে এর অর্থ বলে দেয়া হয়েছে" (তাযকিরাহ্; পৃঃ ৪৪৯)।

তারপর "১৯০৩ইং এরই আর একটি ইলহাম ঃ (অনুবাদ) তিনি আমাকে শুভ সংবাদ দিয়ে বলেছেন, "আমি তোমার সম্পর্কে (কথিত) এমন সব কথার কোনটাকেই রাখব না যা তোমার জন্য অবমাননাকর।" আরো বলেছেন, "আল্লাহ্ তোমার হেফাযত করবেন নিজ থেকে এবং তিনি অসীম দয়ালু, বন্ধু।" [তাযকেরাহ্, পৃঃ ৪৫২]

জানুয়ারী মাসেরই আর একটি ইলহাম ঃ (অনুবাদ ঃ) "আমি সেনাবাহিনী নিয়ে তোমার কাছে আসব। আল্লাহ্ কি তার বান্দার জন্য যথেষ্ট নন? পর্বতমালা! তার সাথে খোদার দরবারে ঝুঁকে পড় এবং হে পক্ষীকুল তোমরাও" [তাযকেরাহ্, পৃঃ ৫৪৫]।

জানুয়ারী ১৯০৩ইং এর একটি কাশ্ফ আছে। বিবরণ এই যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) ইশার নামাযের পূর্বে রূইয়া শোনালেন, "আমি মিশরে নীল নদের কিনারায় দাঁড়িয়ে আছি। আমার সাথে অনেক বনী ইসরাঈলীও আছে। আমি আমাকে মূসা (আঃ) মনে করছি। এমন মনে হচ্ছে যে, আমরা কোথাও পালিয়ে যাচ্ছি। পেছনে নজর করে দেখি, ফেরাউন এক বড় বাহিনী নিয়ে আমাদের পেছনে ধাওয়া করে আসছে। তাদের সাথে অনেক জিনিস-পত্র আছে, ঘোড়া, গাড়ী, রথ ইত্যাদি। তারা আমাদের খুব কাছে এসে গেল। আমার সাথের বনী ইসরাঈলী বড় ভয় পেয়ে গেল। অনেকে হতাশ হয়ে পড়ল- উচ্চস্বরে চিৎকার করতে আরম্ভ করে দিল, 'হে মূসা! আমরা তো ধরা পড়ে গেলাম!' আমি উচ্চস্বরে বললাম, **কাল্লা ইন্না মায়ীয়া রব্বী সাইয়াহ্দিন**, এতক্ষণে আমি জাগ্রত হয়েছি আমার মুখে তখন উপরোক্ত শব্দগুলো ছিল। অনুবাদ ঃ না না, এমন হতে পারে না, আমার প্রভু আমার সাথে আছেন এবং তিনি অবশ্যই আমার জন্য রাস্তা উদ্ভাবন করবেন।

তারপর জানুয়ারী ১৯০৩ইং এরই আর একটি রূইয়া। হযরত (আঃ) লিখেছেন ঃ

"আমি স্বপ্নে দেখেছি, আমি যেমন একটি প্রবন্ধ ছেপে প্রকাশ করতে যাচ্ছি। যেমন করমদীনের মামলার শেষে ফল কী হ'ল [তা প্রকাশ করতে যাচ্ছি]। আমি এ প্রবন্ধের উপর শিরোনাম লিখতে চাচ্ছি, "(অনুবাদ) আল্লাহ্ এ যুদ্ধে কী কী করেছেন-এর বিবরণ।" তারপর আমরা এ প্রবন্ধ প্রকাশ করেছি। সে জীবনের পানি থেকে দূরে সরে গেছে। অতএব তুমি তাকে নিষ্পেষিত করে দাও।

২৮ জানুয়ারী, ১৯০৩ইং তারিখে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন ঃ "আজ সকালে ইলহাম হয়েছে, "সাউক্‌রিমুকা ইকরামান আজীবান", [অনুবাদ ঃ আমি নিশ্চয় তোমাকে আশ্চর্যজনক উপায়ে সম্মানিত করব- অনুবাদক] এর একটু পরেই তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে স্বপ্নে দেখলাম, 'একটি চোগা [লম্বা জামা -অনুবাদক] খুবই চমৎকার সোনালী রং এর; আমি বললাম, "এ চোগা ঈদের দিন পরব।" এখানে 'আজীবান'-শব্দ দ্বারা জানা যায় যে, বড় কোন প্রভাব বিস্তারকারী কথা।

জানুয়ারী, ১৯০৩ইং এর ইলহাম ঃ "ইন্নি মায়ার রসূলে ... (অনুবাদ) আমি আমার রসূলের সাথে দন্ডায়মান হব। আমি বিশেষ রহমতসমূহ নাযেল করব এবং আযাবকে প্রতিহত করব। হে পর্বতসমূহ। হে পক্ষীকুল! তোমরাও আমার এ বান্দার সাথে কান্নাজড়িত কণ্ঠে বিগলিত চিত্তে আমাকে স্মরণ কর। তারা জীবনের পানি হতে দূরে সরে গেছে, সুতরাং তুমি এদেরকে পুরোপুরি নিষ্পেষিত করে দাও।"

তারপর লিখেছেন, ৩০ জানুয়ারী, ১৯০৩ইং তারিখের কথা। "এ রাতে স্বপ্নে দেখলাম, যেমন রাশিয়ার শাসক যারের হাতের ছড়ি আমার হাতে। এর মাঝে লুকানো আছে বন্দুকের নল। উভয় কাজই এর দ্বারা করা যায়। তারপর দেখি যে, সেই বাদশাহ্ যার কাছে বু'আলী সিনা ছিলেন তার ধনুক আমার হাতে। আমি সেই ধনুক দিয়ে একটি বাঘের দিকে তীর চালিয়েছি। বু'আলী সিনাও সম্ভবতঃ আমার সাথেই দাঁড়িয়ে ছিলেন এবং সেই বাদশাহ্ও।"

ফেব্রুয়ারী, ১৯০৩ইং এ ভ্রমণের সময় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) কতিপয় ইলহাম শোনালেন যা গত রাতে তাঁর উপর নাযেল হয়েছে। (অনুবাদ) "আমরা তোমাকে মুক্তি দান করব। এবং তোমাকে বিজয় দান করব। আমি তোমার সঙ্গে এবং তোমার অনুসারীদের সাথে আছি। আমি তোমাকে এতটা সম্মানিত করব যে, মানুষ আশ্চর্য হয়ে যাবে। আমি হঠাৎ করে সেনাবাহিনী নিয়ে উপস্থিত হব। আমি আমার রসূলের সাথে দাঁড়াব এবং এমন জিনিস দেব যা চিরকাল তোমার সাথে থাকবে" (তাযকেরাহ্, পৃঃ ৪৫৯]।

ফেব্রুয়ারী, ১৯০৩ইং (অনুবাদ) "আমি রসূলের সঙ্গে থেকে জবাব দিব। আমি আমার ইচ্ছা কখনও ছেড়ে দিব, কখনও পুরা করব। আর কিছু অংশের অনুবাদ হযরত (আঃ) স্বয়ং করেছেন, "আমি বিশেষ আসবাবপত্র সঙ্গে নিয়ে হঠাৎ করে উপস্থিত হব। আমি আমার রসূলের সমর্থনে [তাদেরকে] ঘিরে ফেলব" [তাযকেরাহ্; পৃঃ ৪৬২]।

১৯০৩ইং এর ইলহাম "(অনুবাদ ঃ) "তারা আগ্রহ করবে যেন তোমার কাজ অসম্পন্ন থাকে। আল্লাহ্ তোমাকে ছেড়ে দিতে চান না যতক্ষণ তোমার কাজ সম্পূর্ণ করে না দেন" [তাযকেরাহ্; ৪৬৬ পৃঃ]।

১৯০৩ইং-এর ইলহাম ঃ "ইন্না নারেসার আবয়া না'কুলুহা মিন আতরাফিহা (অর্থাৎ) আমরা পৃথিবীর ওয়ারিস হব এবং আমরা এর প্রান্ত থেকে গ্রাস করে আসব" (তাযকেরাহ্; পৃঃ ৪৬৬)।

এপ্রিল, ১৯০৩ইং এর ইলহাম ঃ "রব্বি ইন্নী মাযলুমুন ফানতাসির ফাসাহ্হিকহুম তাসহিকা" (অর্থাৎ) হে আল্লাহ্! আমি অত্যাচারিত হয়েছি, তুমি আমাকে সাহায্য কর এবং তাদেরকে ভালভাবে নিষ্পেষিত কর।" বর্তমানে সকল আহমদীর এ দোয়া করা উচিত। এদিকে মনোযোগ দিবেন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন ঃ "আমি একবার কাশ্‌ফে রূপকভাবে আল্লাহ্তাআলাকে দেখেছি। আমার গলায় হাত দিয়ে ঘিরে বললেন, (অর্থ ঃ)" যদি তুমি আমার হয়ে থাক, সমস্ত বিশ্ব তোমার হোক" [তাযকেরাহ্; পৃঃ ৪৭১]।

আগষ্ট, ১৯০৩ইং এর একটি ইলহাম ঃ "(অনুবাদ ঃ) হযরত তোমরা মর্যাদা সম্পর্কে তারা জিজ্ঞেস করবে, তুমি বলে দাও, 'তিনি খোদাতাআলা যিনি আমাকে মর্যাদা দিয়েছেন। আকাশ ও পৃথিবী পুটলীর মত বাঁধা ছিল। তারপর আমরা একে খুলে দিয়েছি। তুমি কি দেখবে না যে, তোমার প্রতিপালক হাতিওয়ালাদের সাথে কী করেছেন? তিনি কি তাদের পরিকল্পনাকে বিনষ্ট করে দেন নি? আল্লাহ্ লিখে দিয়েছেন, "আমি ও আমার রসূলে বিজয়ী হব। তুমি বিজয়ের সময় এসেছ" (তাযকেরাহ্; পৃঃ ৪৮০)।

অক্টোবর, ১৯০৩ইং এর ইলহাম (অনুবাদ) প্রত্যেক ব্যক্তিকে যে এ গৃহে আছে, আমি আলোকিত করব। আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সাফল্য এবং খুলাখুলি বিজয়। খোদার পক্ষ থেকে সাফল্য এবং বিজয়। আহমদের গৌরব। আমি রহমান খোদার উদ্দেশ্যে রোযা রাখার মান্নত করেছি" (তাযকিরাহ্, পৃঃ ৪৯৫)।

নভেম্বর, ১৯০৩ইং এর ইলহাম "মেরি ফাতাহ্ হুয়ি মেরা গালাবা হুয়া" অনুবাদ ঃ আমার বিজয় আমার প্রাধান্য লাভ হয়েছে' [তাযকেরাহ্ঃ পৃঃ ৪৯৮ইং]।

২৬ নভেম্বর, ১৯০৩ইং এর একটি ইলহাম ঃ "লাকাল ফাত্‌হো ওয়ালাকাল গালাবাতো" তোমার জন্য বিজয় এবং তোমার জন্য প্রাধান্য (তাযকেরাহ্; পৃঃ ৪৯৮)।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) লিখেছেন ঃ

"হে লোক সকল! এ ভবিষ্যদ্বাণী তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী যিনি ভূ-মন্ডল ও আকাশমন্ডল সৃষ্টি করেছেন। তিনি তাঁর এ জামাতকে পৃথিবীর সকল দেশে ছড়িয়ে দিবেন। দলিল প্রমাণ দিয়ে, নিদর্শন দিয়ে সকলের উপর একে বিজয় দান করবেন। সে দিন আসছে। বরং খুব নিকটে যখন সমগ্র পৃথিবীতে এই একটি ধর্ম হবে, সম্মানের সাথে একে স্মরণ করা হবে। খোদাতাআলা এ ধর্মকে এ সিলসিলাহ্‌কে (নেযামে জামাতকে) অত্যন্ত উন্নতমানের এবং অসাধারণভাবে বরকতমন্ডিত করবেন। প্রত্যেক এমন ব্যক্তি যে এর ধ্বংসের চিন্তা করে তাকে ব্যর্থ করে দিবেন। এ বিজয় চিরস্থায়ী বিজয়, কিয়ামত আসার পূর্ব পর্যন্ত অটুট থাকবে এ বিজয়। ... স্মরণ রাখ, আকাশ থেকে কেউ নেমে আসবে না। আজ আমাদের বিরোধীরা যারা জীবিত আছে এরা সবাই মারা যাবে ...। তারপর এদের বংশধর যারা অবশিষ্ট থাকবে তারাও মারা যাবে ...। তারপর তাদের সন্তানদের সন্তানেরা মরে যাবে তারাও মরিয়মের পুত্রকে আকাশ থেকে নেমে আসতে দেখবে না। তখন আল্লাহ্ তাদের অন্তরকে ব্যাকুল করে দিবেন যে, ক্রুশ ধর্মের বিজয়ের যুগ পার হয়ে গেল, পৃথিবীর অবস্থা সম্পূর্ণ বদলে গেল। কিন্তু মরিয়ম পুত্র ঈসা এখনও আকাশ থেকে নেমে আসলেন না। তখন বুদ্ধিমানরা এ আকীদার (ধর্ম-বিশ্বাস) প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে যাবে এবং তখনও তৃতীয় শতাব্দীর দিনগুলো শেষ হয়ে যাবে না- যখন হযরত ঈসা (আঃ)-এর আগমনে অপেক্ষায় যারা ছিল, মুসলমান অথবা খ্রীষ্টান সকলেই অত্যন্ত হতাশ হয়ে পড়বে এবং বিশ্বাস হারিয়ে এ আকীদাকে পরিত্যাগ করবে। পৃথিবীতে তখন মাত্র একটিই ধর্ম থাকবে এবং একজনই ইমাম থাকবেন। আমি তো বীজ বপন এসেছি। সুতরাং আমার হাত দিয়ে সে বীজ বপন হয়ে গেছে এবং এখন এ বীজ বৃদ্ধি পেতে থাকবে এর প্রতিফলন বাড়তেই থাকবে এবং এমন কেউ নেই যে, এর গতি রোধ করতে পারে" [তাযকেরাহ্; পৃঃ ৪৯৩]।

ডিসেম্বর, ১৯০৩ইং এর ইলহামের উল্লেখ করা হয়েছে। "হযরত হুজ্জাতুল্লাহ্ (আঃ) গুরুদাসপুর অবস্থানকালে সেখানে উপস্থিত এবং অনুপস্থিত সকল খোদ্দামের জন্য (জামাতের সকলের জন্য) সাধারণভাবে দোয়া করেছেন (ঢালাও ভাবে) যারা উপস্থিত ছিলেন, যাদের নাম স্মরণ এসেছে তাদের নাম ধরে, এবং সকলের জন্য সাধারণভাবে দোয়া করেছেন যার ফলে ইলহাম হয়েছে

"ফাবুশরা লিল মু'মিনীন', সুতরাং মু'মিনদের জন্য শুভ সংবাদ দেয়া হয়েছে" [তাযকেরাহ্; পৃঃ ৪৯৯]।

হযরত আকদস মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর অগণিত রূইয়া এবং ইলহাম রয়েছে, ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে যা আমরা পূর্ণতা লাভ করতে দেখেছি, একবার নয় বার বার। যেমন ধরুন, সাহ্হিকহুম তাসহিকা (তাদেরকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দাও) এর ফলে আমরা কতবার শত্রুদেরকে নিষ্পেষিত হতে দেখেছি এবং তাদের ধ্বংসাবশেষ মাটি হয়ে উড়তে দেখেছি, তাদের সন্তানদের উপরও বিপর্যয় নেমে আসতে দেখেছি। কত নিদর্শন আমাদের ঈমানকে শক্তিশালী করেছে এবং হযরত (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণীসমূহের উপর ঈমানও ইয়াকীন (বিশ্বাস) বৃদ্ধি পেয়েছে। ভবিষ্যতেও ইন্শাআল্লাহ্ ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতা লাভ করবে এবং পূর্ণতা লাভ করতেই থাকবে। আল্লাহ্র ওয়াদা 'আমি আসব, এবং অবশ্যই আসব।' তিনি সত্যই প্রতিজ্ঞা-রক্ষাকারী খোদা। তিনি যখন বলেছেন, 'আমি শত্রুদের ঘেরাও করব,' তখন অবশ্যই তিনি তা করবেন। তিনি অবশ্যই তাদেরকে ঘেরাও করবেন। পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি নেই যা এ সমস্ত অঙ্গীকারকে লক্ষ্যচ্যূত করতে পারে। তবে হ্যাঁ একটি শর্ত আছে আর তা এই যে, **আমরা যেন আন্তরিকতার সাথে এ সবের প্রতি ঈমান রাখি এবং আল্লাহ্র হয়ে যাই। তাঁর ভয়, তাঁর ভীতি আমাদের উপর বিস্তৃতি লাভ করে। প্রত্যেক কাজ-কর্মে তাকওয়া যেন আমাদের আবরণ ও আচ্ছাদন হয়ে, যেন আমাদের দুর্বলতার কারণে আল্লাহ্র ওয়াদা পূরণে দেরী হয়ে না যায়।**

জলসায় শামিল যারা হয়েছেন তাদের পক্ষে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর দোয়াসমূহের কোন কোন অংশ এখন পড়ে শোনাচ্ছি। হযরত (আঃ) দোয়া করেছেন ঃ

"প্রত্যেক ব্যক্তি যে এ জলসায় শামিল হবার জন্য সফরে বেরিয়েছেন, খোদাতাআলা তাদের সাথী হোন। তাদেরকে অনেক পুরষ্কার দান করুন। তাদের প্রতি দয়া করুন। তাদের কষ্ট, তাদের উদ্বেগকে দূর করে, অবস্থাকে তাদের জন্য সহজ করুন। তাদের দুঃখ-দুর্দশা দূর করুন। তাদের সকল কষ্ট দূর করে দিন। তাদের উদ্দেশ্য সফলের জন্য পথ তাদের জন্য খুলে দিন। পরকালে তাদেরকে আল্লাহ্ নিজ প্রিয় বান্দাদের সঙ্গী করে দিন যাদের প্রতি তাঁর ফযল ও রহম রয়েছে। তাদের যাত্রা শেষে তাদের পরে তাদের খলীফা হোন। হে আল্লাহ্! হে বুযূর্গী ওয়ালা, দানশীল এবং রহীম ও কষ্ট দূর করেন যিনি! এ সমস্ত দোয়া কবুল কর। আমাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে উজ্জ্বল নিদর্শনাবলীর সাহায্যে আমাদেরকে বিজয় দান কর। প্রত্যেক প্রকার ক্ষমতা তোমার আছে। সকল শক্তিই তোমার আছে, আমীন, সুম্মা আমীন।'

(ইশতেহার, ৭ ডিসেম্বর, ১৮৯২ইং, মজমুআ ইশ্তেহারত, ১ম খন্ড. পৃঃ ৩৪২)

আল্লাহ্তাআলা আমাদেরকে যেন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর এ সমস্ত দোয়ার ওয়ারীস করেন। আমাদের দ্বারা এমন কোন কাজ যেন না হয়ে যায় ফলে এ সমস্ত দোয়া থেকে আমরা দূরে ছিট্কে পড়ি। দোয়া করতে বহু শক্তি ব্যয় করুন। জলসায় যারা এসেছেন সবার জন্য দোয়া করুন। অনেকে এখনও আসার পথে আছেন, তাদের জন্য দোয়া করবেন। এ জলসার কল্যাণ লাভের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে যারা ঘরে বসে আছেন, শত ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও যারা জলসায় আসতে পারেন নি- তাদেরকে দোয়ায় স্মরণ রাখবেন।

আমি আগেও বলেছি, বড় বিশাল ব্যাপক ব্যবস্থা, সাময়িক ব্যবস্থা, তাই কিছু ব্যবস্থাপনার ত্রুটি থেকেই যাবে। এ অবস্থায় আপনারা আপনাদের এসব কর্মরত ভাইদের প্রতি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি দিবেন। ক্ষমাশীল আচরণ করুন। কোন কর্মরত খাদেম ইচ্ছাকৃত অবহেলা করবে না। সবাই বড় আন্তরিকতার সাথে মহব্বতের সাথে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর মেহমানদের খেদমত নিয়োজিত। আপনারা এদের সাথে আল্লাহ্র খাতিরে যে পুণ্যভরা আচরণ করবেন সেটাও আপনাদের নেকী বলে গণ্য হবে। জলসার যে সমস্ত বরকত লাভ হয় এর মাঝে এটিও একটি বরকত লাভের উপায় হবে। যারা আল্লাহ্র জন্য কোন কাজ করে, তিনি তাদের পুরস্কার দেন না-এটা আল্লাহ্র পদ্ধতি নয়। আল্লাহ্ করুন এ জলসায় আমরা যেন পূর্বের চেয়েও বেশি আল্লাহ্র ফযল দেখি। সব সময় আপনারা আল্লাহ্র ফযলের বেশি বেশি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করুন। আল্লাহ্র শোকরগুযার বান্দা হয়ে যান। বান্দা যখন তার দয়ালু খোদার শোকরগুযারী করে, খোদা দয়াময়, খুবই দয়ালু খোদা, অনেক দান করেন; তিনি পূর্বের চেয়েও বেশি করে দেন। রাজা-বাদশাহ্দের ধন-ভান্ডার শেষ হতে পারে কিন্তু আল্লাহ্র ধন-ভান্ডার কখনই শূন্য হতে পারে না। প্রত্যেক শোকরগুযারীর পরে তিনি তাঁর ওয়াদা অনুসারে অনেক বেশি ফযল ও রহমত দান করেন বা দান করতে থাকেন।

আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকারের এটিও একটি পদ্ধতি যে, আপনারা যে উদ্দেশ্যে এসেছেন অর্থাৎ জলসা শুনবেন, সকল অনুষ্ঠানে যোগ দিবেন; পুরোপুরি অংশগ্রহণ করবেন, বেশি বেশি সুফল লাভের চেষ্টা করবেন। এ তিন দিন পুরোপুরিভাবে আল্লাহ্র মর্জিমত জীবন যাপন করুন, সময় অতিবাহিত করুন। আল্লাহ্ সকলকে এ সমস্ত করার তৌফীক দান করুন।

অবশেষে আমি পুনরায় দোয়ার প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কারণ **একমাত্র দোয়ার মাধ্যমেই আমাদের সকল কাজ সুসম্পন্ন হয়; দোয়ার মাধ্যমেই আমরা সকল প্রকার মঙ্গল, রহমত, বরকত লাভ করি।** জলসার এ দিনগুলোতে অনেক বেশি দোয়া করুন। কালকেও বলেছিলাম, চলতে ফিরতে, উঠতে-বসতে যিক্রে ইলাহী করতে থাকুন। দুরূদ শরীফ পাঠের উদ্যোগ নিবেন। অনেক অনেক ইস্তিগফার করুন। আল্লাহ্ আপনাদের সহায় হউন। আল্লাহ্ আপনাদেরকে জলসার সকল ইলমী (জ্ঞানমূলক) ও রূহানী বরকত দান করুন। এখানে একথাও উল্লেখ করছি যে, ইংল্যান্ডের দূতাবাসগুলো বিভিন্ন দেশ থেকে এ জলসায় আসার জন্য খুব সহজ উপায়ে ভিসা প্রদান করেছে, যারা জলসা শুনতে এসেছেন- জলসার নিয়্যতে ভিসা নিয়েছেন- তারা জলসা শুনবো বলেই ভিসা নিয়েছেন- সুতরাং আপনারা জলসার পরে নিজ নিজ দেশে ফেরত যাবেন। কেউ যেন ইউরোপের কোন দেশে না যান। জলসার পরে প্রোগ্রাম যা-ই হোক, শেষে নিজ নিজ দেশে ফেরত যাবেন, জাযাকুমুল্লাহ্।

(আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন, ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০০৩ইং)।

অনুবাদ ঃ মাওলানা মুহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী
মুরব্বী সিলসিলাহ্

মসীহ্ হিন্দুস্তান মেঁ

মূল ঃ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, মসীহ্ মাওউদ ইমাম মাহ্দী (আঃ)

(১৫তম কিস্তি)

দ্বিতীয় অধ্যায়

(পবিত্র মসীহ্‌র ক্রুশীয় মৃত্যু থেকে উদ্ধার সম্পর্কে পবিত্র কুরআন ও প্রামাণ্য হাদীসাবলী থেকে সাক্ষ্য-প্রমাণ)

এখন যে-সব সাক্ষ্য-প্রমাণ এ অধ্যায়ে আমি তুলে ধরতে যাচ্ছি, এগুলো খৃষ্টানদের ক্ষেত্রে বাহ্যতঃ নিষ্ফল বলে মনে হতে পারে কেননা, তারা পবিত্র কুরআন বা হাদীসকে আলোচ্য বিষয় অকাট্য যুক্তি হিসেবে মানতে বাধ্য নয়। কিন্তু আমি এগুলো কেবল এ উদ্দেশ্যে লিপিবদ্ধ করছি, যাতে খৃষ্টানগণ কুরআন করীম ও আমাদের নবী সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের একটি মু'জিযা (অলৌকিকত্ব) সম্পর্কে অবহিত হন এবং তাদের নিকট এ সত্যটি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, শত শত বছর পরে এখন যে-সব সত্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে তা কুরআন করীম ও আমাদের নবী সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম পূর্বেই বর্ণনা করেছিলেন। অতএব সেগুলোর কিছু সংখ্যক (সাক্ষ্য-প্রমাণ) নিম্নে তুলে ধরছি ঃ

আল্লাহ্‌তাআলা কুরআন করীমে (সূরা নিসা ঃ ১৫৮) বলেন ঃ

وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ وَلٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ ۭ وَاِنَّ
الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِيْهِ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ ۭ مَا لَهُمْ بِهٖ
مِنْ عِلْمٍ اِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ ۚ وَمَا قَتَلُوْهُ يَقِيْنًا ۝

অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে ইহুদীরা হযরত মসীহ্‌কে হত্যা করতে পারে নি এবং ক্রুশবিদ্ধ করেও মারতে পারে নি। বরং তিনি ক্রুশে বিদ্ধ অবস্থায় মারা গিয়েছেন বলে তাদের মনে কেবল এক সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছিল এবং তাদের কাছে তেমন কোন দলিল-প্রমাণ নেই যার দরুন তাদের অন্তর নিশ্চিৎ শংকামুক্ত ও আশ্বস্ত হতে পারতো যে, হযরত মসীহ্ ক্রুশবিদ্ধ হয়ে সত্যি সত্যি মারাও গিয়েছিলেন।

এ আয়াতগুলোতে আল্লাহ্‌তাআলা বর্ণনা করেন, যদিও এটা সত্য যে, মসীহ্‌কে প্রকাশ্যভাবে ক্রুশবিদ্ধ করা হয় এবং তাঁকে মেরে ফেলতে তারা সংকল্পবদ্ধ হয়, কিন্তু ক্রুশবিদ্ধ অবস্থায় প্রকৃতপক্ষেই তিনি প্রাণত্যাগ করেছিলেন বলে ইহুদী ও খৃষ্টানদের পক্ষে মনে করে নেয়া নিছক একটা ধোঁকা বৈ কিছু নয়। বরং প্রকৃতপক্ষে খোদাতাআলা এমন সব পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটিয়ে দেন যার দরুন তিনি ক্রুশীয় মৃত্যু থেকে রক্ষা পান, নিরাপদ থাকেন। এখন ন্যায়বিচারের দাবী অনুযায়ী অবশ্যই স্বীকার করতে হয়, (এক্ষেত্রে) কুরআন করীম ইহুদী খৃষ্টানদের বরখেলাফে যা বলেছিল কেবল তা-ই সত্য সাব্যস্ত হয়েছে। সুতরাং বর্তমান যুগের অতি উচ্চমানের তথ্যানুসন্ধান ও গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, হযরত মসীহ্‌কে প্রকৃতপক্ষেই ক্রুশীয় মৃত্যু থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল। প্রামাণ্য গ্রন্থাদি পাঠে জানা যায়, হাড়-গোড় ভাংগা ছাড়াই কেবল দু'তিন ঘন্টার জন্যে ক্রুশবিদ্ধ থাকায় হযরত মসীহ্ কী করে মারা গেলেন-ইহুদীরা এ প্রশ্নের উত্তর দিতে সর্বদাই অক্ষম থাকে। এ কারণেই বাধ্য হয়ে কিছু সংখ্যক ইহুদী নূতন এক কথা বানায়-তারা বলে, মসীহ্‌কে তারা নাকি তলোয়ারের দ্বারা হত্যা করেছিল। অথচ ইহুদীদের প্রাচীন ইতিহাস অনুযায়ী হযরত মসীহ্‌কে তলোয়ার দ্বারা হত্যা করা প্রমাণিত নয়। আল্লাহ্‌তাআলার কী শান যে, মসীহ্‌কে উদ্ধারকল্পে অন্ধকার ছেয়ে গেলো, ভূমিকম্প এলো, পীলাতের স্ত্রীকে স্বপ্ন দেখানো হলো, সাবাতের রাত আসন্ন হয়ে পড়লো যখন ক্রুশবিদ্ধ কাউকেই আর ক্রুশের ওপরে রাখা সঙ্গত ছিল না, ভীতিপ্রদ স্বপ্নের কারণে হাকিমের অন্তর মসীহ্‌কে রক্ষা করায় মনোযোগী হলো-সহসা একযোগে এ যাবতীয় ঘটনার উদ্ভব আল্লাহ্‌তাআলা এজন্যেই ঘটালেন যাতে মসীহ্‌র প্রাণ রক্ষা করা হয়। তা ছাড়া, মসীহ্‌কে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় (পরিণত) করে দিলেন, যেন সবার কাছে তিনি মৃত বলে প্রতীয়মান হন। আর ভূমিকম্প ইত্যাদি ভয়াবহ ও আতঙ্কজনক নিদর্শন দেখিয়ে ইহুদীদের মাঝে কাপুরুষতা, ভয়-ভীতি ও ঐশী-শাস্তির আশঙ্কাবোধ সৃষ্টি করে দিলেন। তাছাড়া, এ আতঙ্ক তাদের তাড়া করছিল যে, সাবাতের রাতে লাশগুলো যেন ক্রুশের ওপরে থেকে না যায়। আবার এ-ও হলো, ইহুদীরা মসীহ্‌কে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় দেখে তিনি মারা গিয়েছিলেন বলে ধরে নিল। অন্ধকার, ভূমিকম্প ও আতঙ্কজনক পরিস্থিতি বিরাজ করছিল, বাড়ী-ঘর সম্পর্কেও তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হয়ে পড়ে যে, ভূমিকম্প ও অন্ধকারের দরুন হয়তো পরিবার-পরিজনদের ওপর দিয়ে কত কী বিপদ ঘটে যাচ্ছে। আর এ ভীতিও তাদের অন্তরে প্রবলভাবে ছেয়ে যায় যে, এ ব্যক্তি (মসীহ্) যদি তাদের ধারণানুযায়ী মিথ্যেবাদী ও কাফিরই হতো, তাহলে তাকে নির্যাতন ও দুঃখ-কষ্ট দেয়ার বেলায় এমন ভয়াবহ লক্ষণাবলী কেন প্রকাশিত হলো যা ইতোপূর্বে কখনও দেখা দেয় নি? কাজেই তারা উৎকণ্ঠিত চিত্ত হয়ে পড়ার কারণে মসীহ্ মারা গেছেন, না তার অন্য কিছু হয়েছে তা লক্ষ্য করার মত তাদের অবস্থাই ছিল না। তবে প্রকৃতপক্ষে এ যাবতীয় বিষয় ছিল মসীহ্‌কে রক্ষা করার লক্ষ্যে ঐশী-ব্যবস্থা ও পরিকল্পনা বিশেষ। এ দিকেই এ আয়াতটিতে ইঙ্গিত রয়েছে ঃ ওয়া **লাকিন শুব্‌বিহা লাহুম** অর্থাৎ ইহুদীরা মসীহ্‌কে হত্যা করতে পারে নি, বরং আল্লাহ্‌তাআলা তাদেরকে কেবল সন্দেহের আবর্তে ফেলে দেন যেন তারা হত্যা করেছিল। এতে তাঁর ফযল ও অনুগ্রহের ওপর তাঁর সত্যপরায়ণ বান্দাদের আশা-ভরসা বৃদ্ধি পায় যেভাবে ইচ্ছা তিনি তাঁর বান্দাদেরকে বাঁচাতে পারেন।

কুরআন করীমে হযরত মসীহ্ সম্পর্কে এ আয়াতটিতে রয়েছে ঃ (আলে ইমরান ঃ ৪৬) (ওয়াজী হান ফিদ্‌দুনিয়া ওয়াল আখিরাতি ওয়া মিনাল মুকার্‌রাবীন) এর অর্থ হলো, দুনিয়াতেও মসীহ্‌কে তার জীবদ্দশায় ঐশ্বর্য অর্থাৎ সম্মান ও মর্যাদা এবং সর্বসাধারণের দৃষ্টিতে মাহাত্ম্য ও বুযুর্গী প্রদান করা হবে এবং আখেরাতেও (প্রদান করা হবে)। এখন এটা স্পষ্ট যে, হেরড ও পীলাতের দেশে হযরত মসীহ্ কোন সম্মান ও মর্যাদা পান নি, বরং তাঁকে চরম পর্যায়ে লাঞ্ছিত করা হয়। পক্ষান্তরে, এ ধারণা যে, দুনিয়াতে তিনি পুনরায় এসে সম্মান ও মর্যাদা লাভ করবেন এটা এক অলীক ধারণা মাত্র, যা খোদাতাআলার গ্রন্থাবলী এবং তাঁর প্রাকৃতিক বিধানের পরিপন্থী। তদুপরি এটা এক প্রমাণবিহীন বিষয়। কিন্তু বাস্তব ঘটনা ও সত্য বিষয় হলো, হযরত মসীহ্ (আঃ) এ হতভাগ্য অভিশপ্ত জাতির হাত থেকে পরিত্রাণ লাভের পর যখন পাঞ্জাব অঞ্চলে আসলেন এবং একে তাঁর শুভাগমনে সম্মানিত করলেন, তখন এ দেশে খোদাতাআলা তাঁকে প্রভূত সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করলেন এবং বনী ইস্‌রাইলের হারানো সেই দশটি গোত্রকেও খুঁজে পেলেন। প্রতীয়মান হয়, বনী ইস্‌রাঈলের অধিকাংশই এ দেশে আসার পর বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হয়ে পড়েছিল আর তাদের কিছু সংখ্যক লোক অতি নীচু স্তরের প্রতিমা পূজায় ফেসে গিয়েছিল। কিন্তু হযরত মসীহ্‌র এ দেশে

আগমনে তাদের অধিকাংশ সত্য পথে ফিরে আসে। আর যেহেতু হযরত মসীহ্র শিক্ষা ও আহ্বান-বাণীতে আগমনকারী নবীকে বিশ্বাস ও গ্রহণ করার জন্য তাগিদপূর্ণ নির্দেশ ছিল, সেহেতু সেই দশটি গোত্র, যারা এ দেশে আগমনের পর আফগান ও কাশ্মীরী বলে পরিচিত হলো তারা পরিশেষে সবাই মুসলমান হয়ে গেলো। মোট কথা, হযরত মসীহ্ এ দেশে অতি সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হলেন। সাম্প্রতিককালে এ পাঞ্জাব অঞ্চল থেকেই একটি মুদ্রাও আবিষ্কৃত হয়েছে। এতে হযরত মসীহ্ (আঃ)-এর নাম পালী (ভাষার) অক্ষরে খোদিত আছে। এ মুদ্রাটি সে যুগেরই যা ছিল হযরত মসীহ্র যুগ। এতে সুনিশ্চিৎ প্রতীয়মান হয়, হযরত মসীহ্ এ দেশে আসেন এবং রাজকীয় সম্মান লাভ করেন। খুব সম্ভব এ মুদ্রা এমন কোন রাজা কর্তৃক প্রচলিত হয় যিনি হযরত মসীহ্র প্রতি ঈমান এনেছিলেন। আরেকটি মুদ্রাও আবিষ্কৃত হয়েছে। এতে একজন ইস্রাইলী পুরুষের ছবি (অঙ্কিত) রয়েছে। এটিও হযরত মসীহ্রই প্রতিকৃতি বলে বুঝা যায়। কুরআন করীমে আরেকটি আয়াত রয়েছে, যাতে ব্যক্ত হয়েছে যে, মসীহ্কে খোদা এতো আশিস ও কল্যাণ দান করেছেন যে, তিনি যেখানেই যাবেন সেখানেই আশিসমন্ডিত হবেন (সূরা মরিয়ম ঃ ৩২)। সুতরাং এ সকল মুদ্রা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তিনি খোদাতাআলার পক্ষ থেকে প্রভূত কল্যাণ ও আশিস লাভ করেছিলেন। তিনি রাজকীয় মর্যাদার অধিকারী না হওয়া পর্যন্ত মারা যান নি। অনুরূপ, কুরআন করীমে আরও একটি আয়াত রয়েছে ঃ সূরা আলে ইমরান ঃ ৫৬) (ওয়া মতাহ্হিরুকা মিনাল্লাযীনা কাফারূ) অর্থাৎ হে ঈসা! আমি তোমাকে অভিযোগ মুক্ত করবো এ তোমার পবিত্রতা সাব্যস্ত করবো এবং সেসব অপবাদ দূর করে দেব, যা তোমার বিরুদ্ধে ইহুদী ও খৃষ্টানরা আরোপ করেছে। এ ছিল এক বিরাট ভবিষ্যদ্বাণী। এর সারকথা হলো, ইহুদীরা দোষারোপ করেছিল যে, হযরত মসীহ্ ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার দরুন (নাউযুবিল্লাহ্) অভিশপ্ত হয়ে তাঁর অন্তর থেকে খোদার ভালবাসা তিরোহিত হয়েছিল। আর অভিশাপ তথা লা'নত শব্দের মর্মে নিহিত শর্ত অনুযায়ী তাঁর হৃদয় অন্ধকারে ডুবে গিয়েছিল, বিপথগামী হয়ে খোদার প্রতি বিমুখ পাপাসক্ত ও আঁধারে ডুবে গিয়েছিল। সকল পুণ্যের বিরোধী এবং খোদার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে শয়তানের কর্তৃত্বাধীন হয়ে পড়েছিল এবং খোদা ও তাঁর মাঝে সত্যি সত্যি শত্রুতা সৃষ্টি হয়েছিল। আর অভিশপ্ত হবার একই অপবাদ খৃষ্টানরা আরোপ করেছিল। কিন্তু খৃষ্টানগণ নিজেদের অজ্ঞতাবশতঃ পরস্পর বিরোধী দু'টি বিষয়কে একই জায়গায় জুড়ে দেয়। একদিকে তো তারা হযরত মসীহ্কে খোদার পুত্র বলে, অপর দিকে সেই সাথে তাঁকে অভিশপ্তও বলে। অধিকন্তু তারা স্বীকার করে, অভিশপ্ত ব্যক্তি আঁধার ও শয়তানের সন্তান অথবা স্বয়ং শয়তান হয়ে থাকে। অতএব হযরত মসীহ্র প্রতি অত্যন্ত অপবিত্র এসব অপবাদ আরোপ করা হয়েছিল। তবে 'মুতাহ্হিরুকা' আয়াতটির ভবিষ্যদ্বাণীতে এদিকে ইঙ্গিত ছিল যে, এমন এক যুগ আসন্ন, যখন খোদাতাআলা হযরত মসীহ্কে এ সকল অপবাদ থেকে পবিত্র সাব্যস্ত করবেন। অতএব এটাই সে যুগ।

যদিও হযরত ঈসা (আঃ)-এর পবিত্রতা সাব্যস্তকরণ বুদ্ধিমান লোকদের দৃষ্টিতে আমাদের নবী সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সাক্ষ্যের দ্বারাও হয়ে যায়। কেননা আঁ হযরত (সঃ) ও কুরআন করীম সাক্ষ্য দেয়, হযরত ঈসা (আঃ)-এর প্রতি আরোপিত সব অভিযোগই মিথ্যা। কিন্তু এ সাক্ষ্য সর্বসাধারণের দৃষ্টিতে অতি সূক্ষ্ম যুক্তি-নির্ভর ও অস্পষ্ট ছিল। সে কারণে ঐশী ন্যায়নীতি এটাই চায়, হযরত মসীহ্কে ক্রুশবিদ্ধ করা যেমন একটি সুখ্যাত ও দৃশ্যমান ঘটনা ছিল, তেমনি তাঁকে পবিত্র ও নির্দোষ সাব্যস্ত করাও যেন সবার দৃষ্টিতে অতি স্পষ্ট ও পরিদৃশ্যমান বিষয়ে পরিণত হয়। অতএব সেভাবেই ঘটে গেলো। অর্থাৎ তাঁর পবিত্রতা এখন আর কেবল যুক্তি-নির্ভর নয়, বরং সবার কাছে স্পষ্টভাবে সমান ও স্বতঃসিদ্ধ হয়ে পড়েছে। কেননা লক্ষ লক্ষ মানুষ চাক্ষুষভাবে দেখতে পাচ্ছে, হযরত ঈসার কবর শ্রী নগর - কাশ্মীরে বিদ্যমান। আর যেমন গিলগিট বা গলগথায় অর্থাৎ শ্রীর স্থানে হযরত মসীহ্কে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল তেমনি শ্রীর স্থান অর্থাৎ শ্রীনগরে তাঁর সমাহিত হওয়া প্রমাণিত হয়েছে। উভয় স্থানের নামে শ্রী শব্দটি থাকা অবশ্যই এক বিস্ময়কর ব্যাপার। অর্থাৎ যে স্থানটিতে হযরত মসীহ্কে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল সে স্থানটির নামও গিলগিট বা শ্রী এবং উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে যেখানে হযরত মসীহ্র সমাধি প্রমাণিত হয়েছে সে স্থানটির নামও গিলগিট তথা শ্রী। কাশ্মীর এলাকার অন্তর্গত গিলগিট শ্রীর দিকেই এক ইঙ্গিত বটে। খুব সম্ভব এ শহরটি হযরত মসীহ্র যুগেই স্থাপন করা হয়েছিল এবং ক্রুশীয় ঘটনার স্থানীয়ভাবে স্মারক হিসেবে এর নাম গিলগিট তথা শ্রী রাখা হয়, যেমন লাসা যা একটি হিব্রু শব্দ-এর অর্থ উপাস্যের শহর। এটিও হযরত মসীহ্র যুগেই স্থাপিত হয়।

হাদীসের সহী রিওয়ায়াত (বা বর্ণনা)-সমূহের দ্বারা প্রমাণিত যে, আমাদের নবী সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'মসীহ্ একশ' পঁচিশ বছর আয়ু লাভ করেছিলেন।' ইসলামের সকল ফির্কা স্বীকার করেন, হযরত মসীহ্ (আঃ) -এর মাঝে এমন দু'টি বিষয় একত্র সন্নিবেশিত হয়েছিল যা অন্য কোন নবীর মাঝে একত্র হয় নি ঃ (১) তিনি পরিপূর্ণ আয়ু লাভ করে অর্থাৎ একশ' পঁচিশ বছর জীবিত থাকেন। (২) তিনি (তৎকালীন) পৃথিবীর অধিকাংশ ভূখন্ড ভ্রমণ করেন। সে কারণেই তাঁকে সাইয়াহ্ তথা 'পর্যটক নবী' বলা হয়। এখন এটা স্পষ্ট যে, তেত্রিশ বছর বয়সে তাঁকে যদি আকাশে উঠিয়ে নেয়া হয়ে থাকে তাহলে ১২৫ বছর সংক্রান্ত হাদীস সত্য সাব্যস্ত হতে পারতো না। আর না এত অল্প বয়সে অর্থাৎ মাত্র তেত্রিশ বছরে তিনি এত বিরাট ভূ-ভাগ ভ্রমণ করতে পারতেন। অথচ এ সকল রিওয়ায়াত প্রামাণ্য, ও প্রাচীন হাদীস গ্রন্থাবলীতে লিপিবদ্ধ রয়েছে। বরং মুসলমানদের সকল ফির্কায় এ (হাদীস)-গুলো এত ধারাবাহিকভাবে সুখ্যাত যে, এর চেয়ে বেশি সুখ্যাতি কল্পনা করা যায় না। হাদীসের এক জামে (সর্বাঙ্গীন) কিতাব কান্যুল উম্মালের ২য় খণ্ডের ৩৪ পৃষ্ঠায় আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত এ হাদীস লিপিবদ্ধ রয়েছে ঃ "আউহাল্লাহুতাআলা ইলা ঈসা আই ইয়া ঈসান্ তাকিল মিন মাকানিনইলা মাকানিন লিয়াল্লা তুরাফা ফাতুইযা।'

অর্থাৎ আল্লাহ্তাআলা হযরত ঈসা (আঃ)-এর প্রতি ওহী পাঠান' হে ঈসা! তুমি এক জায়গা থেকে আরো জায়গায় স্থানান্তরিত হতে থাক, অর্থাৎ এক দেশ থেকে অন্য দেশের দিকে যাও, যাতে কেউ তোমাকে চিনতে পেরে কষ্ট না দেয়। তারপর এ গ্রন্থেই জাবের (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত এ হাদীস লিপিবদ্ধ আছে ঃ "কানা ঈসাবনু মারইয়ামা ইয়াসীহু ফা ইয়া আম্সা আকালা ...

অর্থাৎ 'হযরত ঈসা (আঃ) সর্বদা পর্যটন (সিয়াহাত) করতেন ও এক দেশ থেকে আরেক দেশের দিকে ভ্রমণ করতেন। সন্ধ্যা নেমে এলে তিনি জঙ্গলের শাক-সব্জি ইত্যাদির কিছু খেয়ে নিতেন এবং নির্মল বিশুদ্ধ পানি পান করতেন (কানযুল উম্মাল, ২য় খন্ড, ৭১ পৃঃ)। অতঃপর এ গ্রন্থেই আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রাঃ) কর্তৃক এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে ঃ 'কালা আহাব্বু ইলাল্লাহিল্ গুরাবাউ ...।

অর্থাৎ, রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেন, 'আল্লাহ্র নিকট সবচেয়ে প্রিয় হলেন সেই সকল লোক যারা 'গরীব'। জিজ্ঞেস করা হলো, গরীব-এর কী অর্থ? তিনি বললেন, তারা সেই সকল লোক যারা দীন অবলম্বন করে নিজ দেশ থেকে মসীহ্র দিকে পলায়ন করে" (৬ষ্ঠ খণ্ড, ৫১ পৃঃ)। (চলবে)

অনুবাদ - মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ

জুমুআর খুতবা

আমাদের হাতিয়ারই হচ্ছে দোয়া

[সৈয়্যদনা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আইঃ) কর্তৃক
২৮ নভেম্বর, ২০০৩ইং তারিখে মসজিদ বাইতুল ফযল লন্ডনে প্রদত্ত]

তাশাহ্হুদ তা'আব্বুয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আইঃ) সূরা নামলের ৬৩তম আয়াত তিলাওয়াত করেন ঃ

اَمَّنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوْٓءَ
وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ الْاَرْضِ ؕ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ؕ قَلِيْلًا
مَّا تَذَكَّرُوْنَ ؕ﴿۶۳﴾

অর্থ ঃ 'কে তিনি, যিনি অস্থির-উৎকণ্ঠিত ব্যক্তির দোয়া কবুল করেন যখন সে তাঁকে ডাকে ও তার কষ্ট দূর করে দেন এবং তোমাদেরকে পৃথিবীর উত্তরাধিকারী করেন? আল্লাহ্‌র সঙ্গে কি আরো কোন উপাস্য আছে? তোমরা খুব কমই উপদেশ গ্রহণ করে থাক।'

পবিত্র রমযান এর অসংখ্য বরকত ও আশিস বয়ে নিয়ে এলো। এথেকে যারা প্রকৃত অর্থে উপকৃত হবার তওফীক লাভ করেছেন অর্থাৎ যারা তাহাজ্জুদ, তারাবীহ্, কুরআন তিলাওয়াত (এক দুই বা তিন খতম), দরসে কুরআন ও দরসে হাদীস শ্রবণ এবং দোয়া ও যিকরে ইলাহীর মাধ্যমে সারা মাস যত্নে রোযা পালন করেছেন তারা অবশ্যই অনুভব করে থাকবেন, রামাযান যেন অতি দ্রুত বেগে স্বীয় আশিস ও বরকত বিতরণ করে চলে গেল। অনেকের ইবাদতের স্বাদ বাড়িয়ে দিয়ে গেল। বিভিন্ন লোক পত্র লেখেন। সেসব চিঠি-পত্রে জানা যায়, আল্লাহ্‌তাআলা অনেককে তাঁর মা'রেফত ও তাঁর অস্তিত্বের প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও দৃঢ়-বিশ্বাসে উন্নতি দান করেছেন। আল্লাহ্ করুন, আমরা যেন এসব বরকত ও আশিস ভালভাবে ধরে রাখি। স্মরণ রাখা আবশ্যক, আমাদের কোন নিজস্ব গুণের কারণে নয়, বরং আল্লাহ্‌তাআলা কেবল তাঁর অনুগ্রহে তাঁর আশিস ও কল্যাণ দিয়ে আমাদেরকে আমাদের ভান্ড ভরে নেয়ার তওফীক দিয়েছেন, রামাযান শেষে এখন আমাদের অবহেলা বা কোন দুর্বলতা বা আত্মম্ভরিতার দরুন আমাদের এসব ভন্ড যেন আবার খালি হয়ে না যায়।

কেউ মনে করতে পারেন, দোয়া ও ইবাদতের ওপর বিগত কয়েকটি খুতবায় আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণের পর এখন কোন নতুন বিষয়ের অবতারণা করা উচিত। কিন্তু দোয়ার বিষয়টি প্রকৃতপক্ষে আমাদের আহমদীদের জন্য এতই জরুরী যে, এছাড়া আমাদের কোন গত্যন্তর নেই। সেজন্যই আমি আবারও জামাতের মনোযোগ আকর্ষণ করছি। রামাযানে আমরা যেভাবে সকলে মিলিতভাবে আল্লাহ্‌র সমীপে প্রণত হয়ে কান্নাকাটি করেছি, সেভাবে এখনও যেন করি। সর্বদাই যেন তাঁর হুযূরে ঝুঁকে তাঁর ফযল ও অনুগ্রহ সকাতরে চাইতে থাকি। এ যুগের তথা মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর যুগের হাতিয়ারই হচ্ছে দোয়া, এ ছাড়া আমরা প্রকৃতপক্ষেই অচল-অক্ষম।

হযরত নবী করীম (সঃ)-এর বিরুদ্ধে তলোয়ার ধারণ করার কারণে তাঁকে (আল্লাহ্ কর্তৃক) তলোয়ার ধারণের অনুমতি দেয়া হয়েছিল। কিন্তু এ যুগে আল্লাহ্‌তাআলা তাঁর মনোনীত বান্দা ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-কে কেবল দোয়ায় অস্ত্রই দান করেছেন। প্রতিশ্রুত মসীহ্ হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) বলিষ্ঠভাবে জোর দিয়ে বলেছেন, এ যুগে তলোয়ার, তোপ বা অন্য কোন অস্ত্রের মাধ্যমে জেহাদ নিশ্চিতভাবে নিষিদ্ধ। এ নিষিদ্ধকরণ তাঁর পক্ষ থেকে নয়, বরং হযরত নবী করীম (সঃ)-এর সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ীই প্রবর্তিত। এ যুগে ইসলামের বিজয় অকাট্য যুক্তি-প্রমাণের সঙ্গে সঙ্গে সকরুণ দোয়ার মাধ্যমেই নির্ধারিত। এটি সেই অস্ত্র যা আহমদী মুসলিম জামাত ছাড়া অন্য কোন ধর্মের বা ফির্কার (অনুসারীর) কাছে নেই। অতএব বর্তমানকালে যা অন্য কারও কাছে নেই সেই দোয়ায় অস্ত্র আল্লাহ্‌তাআলা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর মাধ্যমে কেবল আমাদেরকেই দিয়ে রেখেছেন-এ যে আমাদের পরম সৌভাগ্য।

অতএব যখন এটা একমাত্র অস্ত্র যা অন্য কারও কাছে নেই। তখন আমরা নিজেদের সাফল্য ও বিজয়ের দিন দেখার উদ্দেশ্যে কী করে একে কম গুরুত্ব দিতে পারি? দোয়ার দিকে কী করে কম মনোযোগ দেয়া যেতে পারে? আমরা ধর্মে অবিশ্বাসীদের ন্যায় এ কথা তো বলতে পারি না যে, 'দোয়ার দ্বারাও কি কখনও দুনিয়াকে জয় করা হয়েছে? ঠোঁট নাড়ানোতে কী উপকার লাভ হয়েছে?' আমরা তো বলি, বরং আমাদের এ জবাবই হওয়া উচিত যে, হ্যাঁ!, যখন আল্লাহ্‌র নাম নেয়ার জন্য ঠোঁট নাড়ানো হয়, যখন অন্তরের আওয়াজ ঠোঁটের মাধ্যমে বের হয় ও ক্রমাগত আল্লাহ্‌র সাহায্য চাওয়া হয়, তখন কেবল ধর্মীয় ও পার্থিব সাধারণ উপকারাদি লাভ হয় না, বরং এহেন লোকদের সঙ্গে সংঘর্ষকারীরা, এ আল্লাহ্‌ওয়ালাদেরকে নির্যাতনকারী (বিভিন্ন দলের) সাধারণ লোক হোক বা সরকারই হোক না কেন টুকরো টুকরো ও ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়। আমাদের ভরসাস্থল তো হচ্ছেন সেই আল্লাহ্, যিনি 'আস্‌সামাদ'–অতি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন, অসীম শক্তির অধিকারী খোদা। তিনি মজবুত ও সুরক্ষিত ভরসাস্থল। তাঁর আস্তানাকে যে জড়িয়ে ধরে তিনি তার আশ্রয়স্থল হয়ে যান। তিনি নিজের সাথে জড়িয়ে নেয়ার জন্য, আমাদেরকে নিরাপদ ও সংরক্ষিত করার উদ্দেশ্যে আমাদেরকে ডেকে বলছেন, 'হে আমার বান্দারা! খাঁটি ও একনিষ্ঠ হয়ে আমার কাছে আসো, আমার আশ্রয়কে আশ্রয়স্থল গ্রহণ কর।' শত্রু তোমাদের চুল পরিমাণও ক্ষতি করতে পারবে না। আমাদের খোদা, আমাদের প্রিয় খোদা যখন আমাদেরকে

নিশ্চয়তা দান করেছেন তখন আমরা কী করে তাঁর কাছে চাইতে ও তাঁর সমীপে বিনত হয়ে দোয়া করতে শিথিল হতে পারি?!

জামাতের ও দুনিয়ার অবস্থাবলী লক্ষ্য করে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের পক্ষে আগের চেয়েও বেশি আল্লাহ্তাআলার দিকে ঝোঁকার আবশ্যকতা রয়েছে। আল্লাহ্তাআলা তো সেই আয়াতটিতে যা আমি (প্রথমে) পাঠ করেছি, বলে দিয়েছেন যে, তিনি **মুযতার** (অস্থির-উৎকণ্ঠিত ব্যক্তি)-এর দোয়া শুনেন। অস্থিরচিত্তের দোয়া তিনি কবুল করেন। সে দিক দিয়ে অনেক অনেক দোয়ার প্রয়োজন। আর এটা আমাদের জন্যই নির্ধারিত। কেননা **মুযতার** এর অর্থ কেবল ব্যাকুল ও অস্থির-ই নয়, বরং এমন ব্যক্তি, যার সব পথ বন্ধ ও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। সুতরাং এখন একমাত্র আহমদীয়া জামাতই এমন, যার কোন জাগতিক (সাহায্য - সহায়তা ও পৃষ্ঠপোষকতামূলক) কোন অবলম্বন ও সংযোগ-সম্পর্ক নেই। যে সমাজে তারা বসবাস করে সেখানে যখন দুঃখ-কষ্টের উদ্ভব হয়, তখন সেখানে আমরা সংশ্লিষ্ট প্রশাসন ও সংস্থাগুলোকে অবশ্যই অবহিত করে থাকি, কিন্তু কখনও খোদা বানাই না। কেননা, আমাদেরকে আমাদের জিন্দা খোদা বলে দিয়েছেন, 'যখনই তোমাদের প্রয়োজন হবে, বরং সবসময়ই দৃশ্যতঃ নিরাপদ নির্বিঘ্ন অবস্থায়ও তোমরা এ দৃঢ়-বিশ্বাসের সাথে আমাকে ডাকবে যে, আমি ব্যাকুল-নিরুপায়দের ভরসাস্থল। আমি তাদের দোয়া শুনি। তখন তোমরা সর্বদা আমাকে তোমাদের সম্মুখে বা কাছেই পাবে।' কিন্তু স্মরণ থাকা চাই, ব্যাকুলতার সাথে যেন ক্রমাগত দোয়া করা হয়। যেন তোমাদের অবস্থা বলে ওঠে, 'হীলে সব জাতে রহে, হযরতে তওয়াব হ্যা' (সব কৌশলই অচল, একমাত্র সদয় মনোযোগদানকারী খোদাই আছেন)। তারপর দেখ, আল্লাহ্তাআলা তোমাদের দুঃখ-কষ্ট কীরূপে দূর করেছেন। জালেম কর্মকর্তার থেকেও তোমরা উদ্ধার পাবে। জালেম মৌলবীদের কবল থেকেও উদ্ধার পাবে এবং যালেম সরকার থেকে উদ্ধার পাবে। কিন্তু কেবল কান্নাকাটিই যথেষ্ট নয়। বরং যেভাবে তিনি জানিয়েছেন, 'ইযতিরাব ও ইয্তিরার' (তীব্র ব্যাকুলতা ও নিরুপায়তাবোধ) হওয়া চাই। এ দৃঢ়-বিশ্বাস হওয়া চাই যে, সব রকম শক্তি ও ক্ষমতার উৎস হচ্ছেন একমাত্র খোদাতাআলা। আসমানের খোদা যদি আমাদের সঙ্গে থাকেন তাহলে বাইরে কোন হামলা-আক্রমণ আমাদের কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন ঃ

'কুরআন শরীফে খোদাতাআলা তাঁকে সনাক্ত করার এক চিহ্ন ও আলামতস্বরূপ নির্ধারিত করেছেন যে, তোমাদের খোদা হচ্ছেন সেই খোদা যিনি ব্যাকুলদের দোয়া শুনেন। যেমন তিনি বলেছেন ঃ **আম্মাই ইউজীবুল মুয্তাররা ইযা দাআহু** তারপর খোদাতাআলা যখন দোয়ার কবুলিয়তকে অস্তিত্বের আলামত হিসেবে নির্ধারণ করেছেন, তখন কোন জ্ঞান-বুদ্ধি ও লজ্জাবোধসম্পন্ন মানুষ কীরূপে ধারণা করতে পারে যে, দোয়া করায় তা গৃহীত হবার কোন চিহ্ন প্রতিফলিত হয় না, আর এটা কেবল এমন এক প্রথাগত বিষয় মাত্র যাতে কোন রূহানীয়ত-(এর কার্যকারিতা) নেই। এমন বেয়াদবি কোন সত্যিকার ঈমানদার ব্যক্তি কখনও করতে পারে না। আল্লাহ্ জাল্লাশানুহু যেখানে বলেন, আকাশ ও পৃথিবী (জুড়ে তাঁর বিশাল সৃষ্টি) সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করলে যেমন খোদাতাআলাকে চেনা যায়, তেমনি দোয়ার কবুলিয়ত দেখে খোদাতাআলাতে দৃঢ়-বিশ্বাসের অধিকারী হওয়া যায়। তিনি আরো বলেন, "আল্লাহ্র পবিত্র কালামে **মুয্তার** শব্দটির দ্বারা সেসব বিপদগ্রস্থকে বুঝায় যারা শাস্তিস্বরূপ না হয়ে বরং কেবল পরীক্ষাস্বরূপ দুঃখ-কষ্টের শিকার হয়ে থাকে, কিন্তু যারা কোন শাস্তিস্বরূপ দুঃখ-কষ্টের লক্ষবস্তুতে পরিণত, তাদের ক্ষেত্রে এ আয়াত প্রযোজ্য নয়। নইলে এ-ও আবশ্যকীয় হয়ে পড়ে যে, লূত (আঃ)-এর জাতি, ফেরাউনের জাতি ইত্যাদির দোয়া ওরূপ অবস্থায় কবুল করা হয়। কিন্তু এমনটি হয় নি, বরং খোদার হাত সেসব ব্যক্তিকে নিপাত করে দেয়।' (আংশিক)

- মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ
মুরব্বী সিলসিলাহ্

মুলাকাৎ

বাংলা ভাষা-ভাষীদের সাথে হুযূর রাবে' (রাহেঃ)-এর সাক্ষাৎকার

(১৫-০৪-০৩ তারিখে এম,টি,এ'র মাধ্যমে সরাসরি সম্প্রচারিত এবং অডিও ক্যাসেট থেকে সংকলিত। অনুবাদকের কাজ করেছেন মাওলানা ফিরোজ আলম সাহেব)

প্রশ্ন নং ১ ঃ হুযূর! এক খুতবায় আপনি বলেছেন, হযরত রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম ঋণ শোধ করার সময়ে মূল অর্থের কিছু বেশি ফেরৎ দিতেন, কিন্তু ঋণ গ্রহীতা যদি বেশি না দেয় তাহলে এ প্রসঙ্গে ঋনদাতা কি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে।

হুযূর (রাহেঃ) উত্তরে বলেন ঃ না, এটা ঠিক নয়।

প্রশ্ন নং ২ ঃ পরকালে কোন কোন বিষয় মানুষের মর্যাদার উন্নতির কারণ হবে?

হুযূর (রাহেঃ) উত্তরে বলেন ঃ স্ত্রী পুণ্যবতী হলে তার স্বামীর এটাও মর্যাদার উন্নতির একটি কারণ হতে পারে। যে সন্তানের মৃত্যুতে ধৈর্য ধারণ করে তারও মর্যাদার উন্নতি হতে পারে।

প্রশ্ন নং ৩ ঃ এক হাদীসে উল্লেখ আছে, হযরত নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের মাঝে ততক্ষণ পর্যন্ত নবুওয়ত বলবৎ থাকবে যতক্ষণ আল্লাহ্তাআলা চাইবেন, অতঃপর আল্লাহ্তাআলা তা উঠিয়ে নিবেন, অতঃপর নবুওয়তের পদ্ধতিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে ...। এ হাদীসের শেষে বলা হয়েছে অতঃপর নবী (সঃ) নীরব হয়ে গেলেন। এখানে নীরব হয়ে যাওয়া বলতে কী বুঝাচ্ছে?

হুযূর (রাহেঃ) উত্তরে বলেন ঃ এর অর্থ এই যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর মাধ্যমে শেষ যুগে যে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত করা হবে তা

চিরস্থায়ী হবে না। শেষ পর্যন্ত তা ধ্বংস হয়ে যাবে। যেভাবে বিশ্বজগতের রীতি রয়েছে যে, সূর্য উদিত হয় আবার অস্তও যায়। বড় বড় জাতি উন্নতি করে আবার অধঃপতিতও হয়। এভাবে এটা ধারণা করা যে, আহমদীয়তের সূর্য সর্বদাই উন্নতির পথে থাকবে- এটা ঠিক নয়। আহমদীয়তের যে খিলাফত এক সময় এসে তা-ও পার্থিব খিলাফতে পরিণত হবে। এজন্যে রসূলে করীম (সঃ) এখানে এসে নীরবতা পালন করেছেন।

হুযূর (রাহেঃ) কৌতুক বলেন ঃ একটি প্রাইমারী স্কুলের একজন শিক্ষক প্রশ্ন করলেন, বলতো, আমেরিকা কোথায়? ছাত্র বললো, জানি না। শিক্ষক বল্লেন, তুমি বেঞ্চের ওপর দাঁড়াও। সে বল্লো, বেঞ্চে দাঁড়ালে কি আমেরিকা দেখা যাবে?!

আর এক ছাত্র গেছে পরীক্ষা দিতে। শিক্ষক জিজ্ঞেস করলেন, কেমন হয়েছে তোমার প্রশ্ন? ছাত্র বল্লো, প্রশ্ন তো খুবই ভাল। কিন্তু উত্তর খুবই কঠিন!

প্রশ্ন নং ৪ ঃ পিতা-মাতার পর কার মর্যাদা সবচে' বড়?

হুযূর (রাহেঃ) উত্তরে বলেন ঃ পিতা-মাতার পরে পিতা-মাতার মর্যাদাই সবচে' বড়। কোন কোন হাদীসে এসেছে লোকেরা জানতে চাইলো, হে আল্লাহ্‌র রসূল! কার সেবা করা আবশ্যকীয়। হুযূর (সঃ) বল্লেন, পিতা-মাতার। তারপর আবার জিজ্ঞেস করা হলো, এরপর কার? হুযূর (সঃ) বল্লেন, এরপর পিতামাতার। পুনরায় জিজ্ঞেস করা হলো। এরপর কার? বলা হলো পিতা-মাতার। তদুপরি এতীমদের সেবা করা খুবই জরুরী। আর মিসকীনদের, বিধবাদের সেবা করাও। এসব আল্লাহ্‌র নিকটে খুবই গ্রহণীয়।

প্রশ্ন নং ৫ ঃ নামাযের দু'রাকাআতে একই সূরা পড়লে অসুবিধা আছে কি?

হুযূর (রাহেঃ) উত্তরে বলেন ঃ কোন অসুবিধা নেই।

প্রশ্ন নং ৬ ঃ সূরা মা'আরিজের ৫৫ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ রূহল কুদুস ও ফিরিশ্‌তাগণ তাঁর দিকে আরোহণ করে যার পরিমাণ ৫০ হাজার বছর। এখানে রূহুল কুদুস ও ফিরিশ্‌তাদের মাঝে পার্থক্য কী?

হুযূর (রাহেঃ) উত্তরে বলেন ঃ রূহুল কুদুস দ্বারা হযরত জিব্‌রাইলকে বুঝায়। ফিরিশ্‌তাগণ দ্বারা সাধারণ সব ফিরিশ্‌তাকে বুঝায়।

প্রশ্ন নং ৭ ঃ মানুষের নাম অনেক সময়ই খোদাতাআলার গুণবাচক নামে রাখা হয় যেমন রহমান, কুদ্দুস, মু'মিন। এসব ব্যক্তিকে সম্বোধনের ক্ষেত্রে উক্ত নামে ডাকা হয়। উক্ত নামে ডাকা ঠিক হবে কি নাকি আব্দুর রহমান, আব্দুল কুদ্দুস, আব্দুল মু'মিন, এভাবে ডাকতে হবে?

হুযূর (রাহেঃ) উত্তরে বলেন ঃ কোন দোষ নেই। যাদের নাম আব্দুর রহমান, আব্দুল কুদ্দুস বা আব্দুল মু'মিন তাদেরকে যদি কেউ রহমান, কুদ্দুস বা মু'মিন ডাকে তাহলে কোন অসুবিধা নেই। আর শুধু মু'মিন নামে পাতিয়ালার আমাদের এক ভাই কাদিয়ানে ছিলেন। মু'মিন সাহেব খুব বুযূর্গ লোক ছিলেন। একবার তিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-কে একখানা পত্র লেখেন, তাতে লেখেন আমাদের এলাকাতে একজন ওয়ায়েয (বক্তা) আছেন। তিনি বৃহস্পতিবার বক্তৃতা করেন। তিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-কে অনেক গালি-গালাজ করেন। আমি এটা সহ্য করতে পারি না। এমতাবস্থায় আমি কী করতে পারি? হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) তাকে লিখেন, আমি হাকীকাতুল ওয়াহী পুস্তক পাঠাচ্ছি। আপনি বই থেকে কয়েক পৃষ্ঠা পাঠ করে শুনাবেন। সে যদি শুনতে না চায় তাহলে তার মেম্বরের ওপরে বইখানা রেখে এসে যাবেন। খোদা তার সাথে যথাযথ ব্যবহার করবেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর নির্দেশমত তিনি (ওয়ায়েয) এক মাহফিলে বইখানা পাঠ করার কথা বললে তিনি খুব রাগ করেন এবং আরও বেশি গালি-গালাজ করেন এবং তাঁকে (মু'মিন সাহেব) ধমকি দিয়ে বললেন, আমাকে মির্যা সাহেবের বই থেকে কিছু শুনাবেন না। এরপর তিনি মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর নির্দেশ অনুযায়ী পুস্তক খানা তার মিম্বরের ওপরে রেখে আসেন। এর কিছুদিন পরেই সেই ব্যক্তি পাগল হয়ে যায়। তার অবস্থা এমন খারাপ হয়ে গিয়েছিল যে, সে নিজের প্রস্রাব নিজে পান করতো এবং কুকুরের মত নোংরা ময়লা ইত্যাদি চাটাচাটি করতো।

প্রশ্ন নং ৮ ঃ পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে- তোমাদের পিতা-মাতা যখন বৃদ্ধাবস্থায় পৌছে তখন তোমরা তাদের প্রতি 'উহ্' শব্দটিও উচ্চারণ করবে না। কিন্তু কেউ এটা করে বসলে এর শাস্তি ও প্রায়শ্চিত্ত কী?

হুযূর (রাহেঃ) উত্তরে বলেন ঃ এর প্রায়শ্চিত্ত হলো ইস্তিগফার ও সদকা-খয়রাত।

প্রশ্ন নং ৯ ঃ জামাতে আহমদীয়ার পাঞ্জাব থেকে হিজরত করার কারণ কী?

হুযূর (রাহেঃ) উত্তরে বলেন ঃ এখন পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে যে হিজরত করতে হয় তা মুসলমান মৌলভীদের কারণে আর আগে পূর্ব পাঞ্জাব থেকে যে হিজরত করতে হয়েছিল তা হিন্দুদের কারণে। হিন্দু ও শিখরা মুসলমান বিশেষ করে আহমদী মুসলমানদের ওপরে খুব জুলুম-নির্যাতন করেছিলো, আক্রমণ করেছিলো। হিন্দু ও অন্যান্য কিছুলোক দলবদ্ধভাবে আক্রমণ করতো আর এতে অনেক আহমদী শহীদ হয়েছিলেন। এরপর বাধ্য হয়ে তাদের জন্মভূমি ত্যাগ করতে হয়েছিলো। সুতরাং দু'টো হিজরতই পৃথক পৃথক। এক হিজরত হলো জাতীয় শত্রুতার কারণে আর একটি হিজরত হলো ধর্মীয় কারণে।

প্রশ্ন নং ১০ ঃ জুমুআর খুতবা শুরু হওয়ার পরে কেউ যদি মসজিদে প্রবেশ করে তবে ফরয নামাযের আগের সুন্নত কখন পড়া উচিত ঃ

হুযূর (রাহেঃ) উত্তরে বলেন ঃ যখন খুতবা শেষ হয়ে যায় এবং তকবীর আরম্ভ হয় তখন সংক্ষেপে পড়ে নিতে পারে অথবা খুতবার অব্যবহিত পরে তাড়াতাড়ি করে পড়ে নিতে পারে।

প্রশ্ন নং ১১ ঃ পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে যে, ইহুদীরা সাবাতের প্রতি অবহেলা দেখাবার কারণে খোদাতাআলা তাদেরকে শাস্তি দিয়েছেন। অনেক মুসলমানও জুমুআর নামাযের প্রতি অবহেলা দেখিয়ে থাকেন। এজন্যে সেসব মুসলমান কি একই ধরনের শাস্তির সম্মুখীন হবে?

হুযূর (রাহেঃ) উত্তরে বলেন ঃ মুসলমান তো আল্লাহ্‌র আযাবের সম্মুখীন হচ্ছেই। এর কারণ জুমুআ নয় বরং আল্লাহ্‌র নাফরমানী বা অবাধ্যতাই এর কারণ। তারা আল্লাহ্‌র ক্রোধের শিকার হচ্ছে।

প্রশ্ন নং ১২ ঃ ব্যস্ততা ও অস্থিরতার কারণে অনেক সময় দোয়া এবং ধর্মীয় কাজে মনোনিবেশ করা দুষ্কর হয়ে পড়ে। এর প্রতিকার কী?

হুযূর (রাহেঃ) উত্তরে বলেন ঃ এতো উল্টো কথা বলা হলো। ব্যস্ততা ও অস্থিরতার কারণে আরও বেশি মনোনিবেশ করা দরকার এবং আল্লাহ্‌র দিকে বেশি ঝোঁকা আবশ্যক।

প্রশ্ন নং ১৩ ঃ কেউ যখন অপরাধ করে তখন কি তার ওপর শয়তান সওয়ার হয়ে যায়?

হুযূর (রাহেঃ) উত্তরে বলেন ঃ সে শয়তানে পরিণত হয়ে যায় না তার ওপরে শয়তান প্রাধান্য বিস্তার করে। ক্রোধকেও শয়তান বলা হয়েছে। রসূলে করীম (সঃ) বলেছেন, যখন কারও রাগ ওঠে তখন যেন পানি পান করে। আর এর পরে বসে যায় আর এর পরও রাগ না কমলে সে যেন বিছানায় শুয়ে পড়ে।

প্রশ্ন নং ১৪ ঃ পান খাওয়া কি ভাল?

হুযূর (রাহেঃ) উত্তরে বলেন ঃ পানের মাঝে উপকারিতাও রয়েছে। এজন্যে যে দাঁত পরিষ্কার হয়। দাঁত মজবুত থাকে। এর ক্ষতিকর দিকও রয়েছে। পানের সাথে তামাক ব্যবহার করলে গলার ক্যান্সার হয়ে থাকে। তাই দেখতে হবে পানের সাথে কী খাচ্ছে।

হযরত আম্মাজান পান খেতেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) ও তাঁর কাছ থেকে নিয়ে নিজেও কয়েকবার পান খেয়েছেন। ছোটরা মিষ্টি পান খেয়ে থাকে এতে কোন দোষ নেই। এতে মিষ্টি অধিক পরিমাণে থাকে।

প্রশ্ন নং ১৫ ঃ ইসলামে চুরির শাস্তি হাত কাটা। তবে ডাকাতির শাস্তি কি?

হুযূর (রাহেঃ) উত্তরে বলেন ঃ কুরআনে করীমে ডাকাতির বহু শাস্তির কথা বলা হয়েছে। এর মাঝে একটি হাত পা বিপরীত দিক থেকে কেটে দেয়া। আর একটি হলো শুলবিদ্ধ করা হয়। সাধারণ চুরির শাস্তি থেকে ডাকাতির শাস্তি কঠোর।

প্রশ্ন নং ১৬ ঃ শিয়ারা মুহর্‌রমের সময় বিলাপ করে, হা-হুতাশ করে। এর পটভূমি কী?

হুযূর (রাহেঃ) উত্তরে বলেন ঃ পুরাতন যুগে এসব ছিলো না। কারবালার পরে দীর্ঘ দিন পর্যন্ত শিয়ারা এসব কখনও করে নি। অনেক পরে এগুলো শুরু হয়েছে আর এর অধিক প্রচলন হয়েছে হিন্দুস্তানে। আফগানিস্তান প্রভৃতি স্থানেও শিয়ারা রয়েছে, কিন্তু তাদের মাঝে এসবের কোন হদীস পাওয়া যায় না। এক পাঠান সম্বন্ধে বলা হয়, সে মুহর্‌রমের দিনগুলোতে পেশোয়ার এসেছে। পেশোয়ারে তিনি সবাকে হা-হুতাশ করতে দেখে ও বুক চাপড়াতে দেখে বললেন, কী ব্যাপার শহরে কোন বড়লোক মারা গেল নাকি? উত্তরে বলা হলো, তুমি জান না যে, ইমাম হাসান ও হুসায়েনের শাহাদতের স্মরণে এ রকম করা হচ্ছে? তিনি বল্লেন, তাঁরা তো ১৪শ' বছর পূর্বে শাহাদত বরণ করেছেন। এর সংবাদ তাহলে আজকেই এখানে এসেছে?!

প্রশ্ন নং ১৭ ঃ খুজূ যিনাতাকুম ইনদা কুল্লি মাসজিদিন (অর্থাৎ তোমরা প্রত্যেক মসজিদে সৌন্দর্য অবলম্বন করো) আয়াতের তাৎপর্য কী?

হুযূর (রাহেঃ) উত্তরে বলেন ঃ এখানে **'যিনাত'** অর্থ তাকওয়া। আল্লাহ্তাআলার তাকওয়া অবলম্বন করে মসজিদে যাও এটা তোমার যিনাত বা সৌন্দর্য। এটা তোমার সাথে যাবে। ভাল ভাল কাপড়-চোপড় পরাই কেবল যিনাত নয়। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কাপড় পরার আদেশ রয়েছে। সুন্দর সুন্দর কাপড় পরার আদেশ নেই। **লিবাসুত্তাকওয়া যালিকা খয়ের-** তাকওয়ার পোষাক পরে যাও। এটাই সবচে' উত্তম। তোমাদের সৌন্দর্য তোমাদের সাথে যাওয়া আবশ্যক। মসজিদ তোমাদেরকে সৌন্দর্য ততক্ষণ পর্যন্ত দিবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা তোমাদের সাথে তাকওয়ার সৌন্দর্য নিয়ে না যাবে।

মসজিদে যেতে কাউকে বাধা দেয়ার বিষয়টি কুরআন করীম খুবই অপসন্দ করেছে। বিশেষ করে পাকিস্তানে দেখা যায়। অনেক আহমদীকে মসজিদে গিয়ে নামায পড়তে বাধা দেয়া হচ্ছে। এ রীতি খৃষ্টানদের মাঝে প্রচলিত হয়। এখনকার দিনে আছে কি নেই তা জানা নেই। এক সময় আমেরিকাতে কৃষ্ণাঙ্গ খৃষ্টান ও শেতাঙ্গ খৃষ্টানদের মাঝে খুবই বৈষম্যের দৃষ্টিতে দেখা হতো। কোন কোন গির্জা ছিলো কেবল শেতাঙ্গদের জন্যে। কৃষ্ণাঙ্গদের সেখানে প্রবেশের অধিকার ছিলো না। কথিত আছে একবার এক কৃষ্ণাঙ্গ বেচারা খুবই শখ করে উপাসনা করতে গেছে। তাকে মার-পিট করে বাইরে বের করে দেয়া হয়েছে। সাবধান! তুমি এখানে কখনও প্রবেশ করবে না। সে গির্জার সিঁড়ির ওপরে বসা ছিলো। সে স্বপ্নে হযরত ঈসা (আঃ)-কে দেখলো। তিনি বললেন, তুমি কাঁদছো কেন? সে বল্লো, আমি কেবল আপনার উদ্দেশ্যে উপাসনার জন্যে সেখানে গিয়েছিলাম। কিন্তু তারা আমার সাথে এ আচরণ করেছে। হযরত ঈসা (আঃ) বল্লেন, চিন্তা করার কোন কারণ নেই। আমিও সেখানে যাই না!

প্রশ্ন নং ১৮ ঃ মহিলারা তাদের বিশেষ দিনে রোযা রাখে না এবং নামাযও পড়ে না। পরে রোযা রাখার নির্দেশ রয়েছে কিন্তু নামায পড়ার নির্দেশ নেই কেন? এর তাৎপর্য কী?

হুযূর (রাহেঃ) উত্তরে বলেন ঃ খোদাতাআলা উত্তম জানেন।

প্রশ্ন নং ১৯ ঃ 'শাহিদাল্লাহ্' শব্দের অর্থ কী?

হুযূর (রাহেঃ) উত্তরে বলেন ঃ আল্লাহ্র সাক্ষ্য সবচে' বিশ্বস্ত ও জোরালো। যে বিষয় সম্বন্ধে বলা হয় যে, আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিচ্ছেন। এর অর্থ হলো সেই বিষয়ের সত্যতা বা বস্তুনিষ্ঠার ওপরে এটা একটা জোরালো সাক্ষ্য।

প্রশ্ন নং ২০ ঃ কুরআন মজীদের সূরা আলে ইমরানের আয়াত নং ১৫। এখানে আল্লাহ্তাআলা অনেক কিছু মনোরম করে দেখিয়েছেন। আল্লাহ্তাআলা মনোরম করে দেখিয়েছেন এবং তিনি এর স্বীকৃতি দিয়েছেন। তাহলে এর প্রতি আকৃষ্ট হলে মানুষকে দায়ী করা হয় কেন?

মাওলানা ফিরোজ আলম সাহেব আয়াতটি পাঠ করেন। তার প্রশ্নটি **জুয়্যিনা**-এর সাথে সম্পর্ক রাখে।

হুযূর (রাহেঃ) উত্তরে বলেন ঃ আল্লাহ্তাআলা স্বয়ং এসব বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। আবার সাবধানও করেছেন যে, এর আকর্ষণ থেকে অবৈধ সুযোগ নিবে না। এতে ডুবে যাবে না। এর পেছনে উন্মাদের মত ছুটবে না।

হুযূর (রাহেঃ)-এর অনুমতিক্রমে সুলতান সাহেব একটি কৌতুক শুনান ঃ

এক ছেলে চুরি করে আম পাড়ছে। মালিক এসে তাকে ধরে ফেলে। মালিক বললেন, চলো। তোমাকে তোমার বাবার কাছে নিয়ে যাই। বাবার কাছে নিয়ে তোমার বিরুদ্ধে বিচার দেবো। তুমি চুরি করে আম পাড়ছো কেন? ছেলেটি বল্লো, আপনাকে বেশি দূর যেতে হবেনা। আমার বাবা ঐ পাশের গাছে আম পাড়ছেন!

প্রশ্ন নং ২১ ঃ মহিলারা কি বিয়ের সাক্ষী হতে পারে?

হুযূর (রাহেঃ) উত্তরে বলেন ঃ হ্যাঁ, হতে পারে। তবে মেয়েদের মাঝে বসে সাক্ষ্য দিবে পুরুষদের মাঝে গিয়ে নয়।

প্রশ্ন নং ২২ ঃ চিকিৎসা শাস্ত্রের উন্নতি সত্ত্বেও নতুন নতুন মহামারী দেখা দেয়। হুযূর কি মনে করেন যে, কোন এক সময় মানুষ সকল রোগের ওপরে নিয়ন্ত্রণ লাভ করবে?

হুযূর (রাহেঃ) উত্তরে বলেন ঃ কখনও নয়। সমস্ত রোগের উপরে মানুষ নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না। প্রতিকূল পরিস্থিতির সাথে মানুষ যে সংগ্রাম করছে তা অব্যাহত থাকবে। এক সমস্যা মানুষ কাটিয়ে ওঠবে তো আর একটা সমস্যার সম্মুখীন হবে। এটা সব সময়েই থাকবে।

সংকলন ঃ **নূরুদ্দীন আমজাদ খান চৌধুরী**

[এটাই হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ)-এর সাথে বাঙ্গালীদের শেষ মুলাকাৎ অনুষ্ঠান - **নির্বাহী সম্পাদক**]

ঐশীবাণী, যুক্তিবাদিতা, জ্ঞান এবং সত্য

মূল ঃ হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ)

পর্ব ৩ ঃ অধ্যায় ঃ ২

অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের মাঝে খোদা-সম্পর্কীয় ধারণা

(পূর্ব প্রকাশিত অংশের পর)

উক্ত বিষয় সম্পর্কিত আলোচনায় এ বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনার দাবী রাখে যে, বিভিন্ন কুসংস্কার ও প্রচলিত ধ্যান-ধারণা এসব আদিবাসীদের ধর্মীয়-বিশ্বাস হিসাবে প্রতিফলিত হবে ও এক সুউচ্চ পরমেশ্বরের স্বীকৃতি সকলের মাঝে আজও বিদ্যমান এবং অনেকটা অটুট রয়ে গেছে। কুসংস্কার সম্পর্কিত ধারণা হয়তো এক গোত্র থেকে অন্য গোত্রের মাঝে কিছুটা আলাদা, কিন্তু এক মহান স্রষ্টার উপর তাদের বিশ্বাসের বিষয়টি প্রায় অপরিবর্তিত। এ পরিপ্রেক্ষিতে সমাজতাত্ত্বিকদের এটা চিন্তা করে দেখা দরকার যে, বিবর্তনের মাধ্যমে ক্রমশ নীচু স্তর থেকে উন্নীত হয়ে খোদা সম্পর্কিত ধারণার সৃষ্টি হয়েছে বলে তারা যে ব্যাখ্যা দেন, অষ্ট্রেলিয়ার এসব আদিবাসীদের মাঝে বিরাজমান খোদা-সম্পর্কীয় ধারণাটিকে সেই আঙ্গিকে কি করে সামঞ্জস্য বিধান করা যায়? এতে এটাই তো দেখা যাচ্ছে যে, বর্ণনার সামান্য হেরফের ছাড়া এসব আদিবাসী এক আল্লাহ্ বা পরমেশ্বরের অস্তিত্বের বিষয়ে সন্দেহমুক্ত। দৃষ্টান্তস্বরূপ Wimbaio গোত্র মতে পৃথিবীর সৃষ্টি লগ্নে ঈশ্বর পৃথিবী পৃষ্ঠেই অবস্থান করতেন, কিন্তু কাজ শেষে তিনি মহাশূন্যে তার সুউচ্চ আসনে আরোহণ করেছেন। অপরদিকে Wotjobahek গোত্রের বিশ্বাস মতে Bunjil হচ্ছেন সেই ঈশ্বর, যিনি একজন মহামানব হিসাবে এক সময় ভূ-পৃষ্ঠেই অবস্থান করতেন, কিন্তু সৃষ্টিকর্ম শেষে তিনি আকাশে উঠে যান।

তবে সমাজতাত্ত্বিকদের অবশ্যই একথা ভুলে গেলে চলবে না যে, পাঁচশতেরও অধিক সংখ্যক গোত্র যেখানে খোদার অস্তিত্বকে তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের এক শাশ্বত উপাদান হিসাবে বিবেচনা করে, সেখানে সেই খোদা মানব আকৃতির বা অন্য কোন অদৃশ্য শক্তিসম্পন্ন সেটা এ প্রসংগের কোন কেন্দ্রীয় সূত্র নয় (not central to the issue)। আরো রয়েছে তাদের এ বিশ্বাসের একটি মুখ্য নৈতিক প্রাজ্ঞতার স্বীকৃতি, আর তা হলো এই যে, পৃথিবী যেসব জিনিষকে এমন প্রাকৃতিক শক্তিবলয় হিসাবে গণ্য করে তা শুরুতেই পরমেশ্বরের সাথে শাশ্বত উপাদান হিসাবে বিরাজমান ছিল না (did not eternally coexist with the supreme creator) বরং এগুলোকে পরবর্তীতে মানুষের জীবন ধারণের উপযোগী করে সৃষ্টি করা হয়েছে।

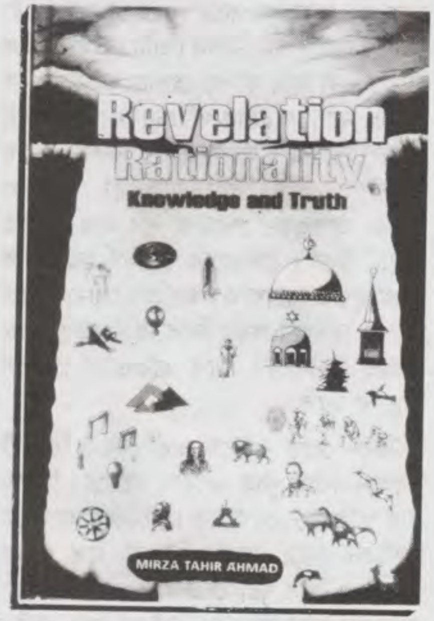

সমাজতাত্ত্বিক ও নৃ-তত্ত্ববিদের ব্যাখ্যাও আবার সর্ববাদীসম্মত নয়। অনেক নৃ-তত্ত্ববিদ খোদা সম্পর্কীয় ধারণার উদ্ভব ও লক্ষ্য এ দুটোকেই সন্দেহের চোখে দেখেন। বিশেষ করে এসব আদিবাসীদের বর্ণিত High Gods আর প্রচলিত ধর্ম-বিশ্বাস অনুযায়ী স্রষ্টা বা ঈশ্বর যে একই অর্থ বহন করে তা তারা মানতে নারাজ। তাদের মতে অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের মত খুবই নীচু মেধার লোক (inferior people as the primitive Australians) কি করে ঈশ্বর চিন্তার মত একটি পরিণত ধারণার মনোভাব পোষণ করতে পারে? এটা তাই তাদের জন্য বিশ্বাস করা খুবই কঠিন যে, অনগ্রসর একটি সমাজের ধারণায় প্রকৃতই উচ্চ ঈশ্বর বা এক মহান স্রষ্টার অস্তিত্ব সম্পর্কে সত্যিকার ধারণা আজও পরিদৃশ্যমান! (It is difficult for them to believe that the primitive Australians could hold such advanced conceptions)।

আজ সমাজতাত্ত্বিকদের তথা-কথিত ধর্মীয় ব্যাখ্যার অসারতা তাই সুস্পষ্ট ও আত্ম-প্রকাশকারী (self evident)। তাদের ধারণা মতে কোন জিনিষকে অনুধাবন করা সহজ নয় বলেই তো একটা সত্য মিথ্যা হয়ে যেতে পারে না। ধর্মীয় বিশ্বাসের বিবর্তন সংক্রান্ত সমাজতাত্ত্বিকদের এতদিনকার ব্যাখ্যা তাই অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের এক স্রষ্টার অস্তিত্বের অবিসংবাদিত বিশ্বাসের ভিত্তিতে আজ এক যুক্তিবিহীন ব্যক্তিগত ভাবনার প্রতিফলন (prejudicial attitude) হিসাবে পরিগণিত হয়েছে। বস্তুত, এটা এক ধরনের ছেলে মানুষী ও বিভ্রান্ত মনোভাব (childish sulky rasponse) ছাড়া আর কিছুই নয়।

সমাজতাত্ত্বিকদের এ নাজুক পরিস্থিতি থেকে বাঁচবার প্রয়াসে এবং অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অদিবাসীদের ধর্মীয় বিশ্বাসের এ অসংগতি নিরসনের লক্ষ্যে E. B. Tylor নামক একজন প্রাবন্ধিক কিছু অভিনব বক্তব্য নিয়ে এগিয়ে এসেছেন। ১৮১১ সালে Journal of Anthropoligical Institute থেকে প্রকাশিত Limits of savage religion শীর্ষক এক প্রবন্ধে E. B. Tylor অভিমত ব্যক্ত করেন, উচ্চ ঈশ্বর সম্পর্কিত আদিবাসীদের ধারণাটি অষ্ট্রেলিয়ায় খ্রীষ্টান মিশনারীদের প্রচারের প্রভাবজনিত একটি ব্যাপার (product of influences from the Christian missionaries on Australian religion)। যদিও ইতিহাসের ঘটনা প্রবাহ বিশ্লেষণের ফলে এ ধারণাটিও একটি ডাহা মিথ্যা হিসাবে প্রকাশিত হয়ে পড়ে (it is completely belied by the facts of history)। এহেন অবস্থায় A. W. Howitt নামের আরেকজন বিবর্তনবাদী E. B. Tylor এর উক্ত ধারণাকে খন্ডন করে বলেন, দক্ষিণ-পূর্ব অষ্ট্রেলিয়ার কোন কোন আদিবাসীর একেশ্বর সম্পর্কিত ধারণাটি এমন এক সময়ের যখন সেখানে কোন পাশ্চাত্য মিশনারীদের আগমনই ঘটে নি (preceded the arrival of any missionaries, or indeed any western settlers among them)। আর Tylor এর

অভিমতকে সরাসরি এজন্যও প্রত্যাখ্যান করা যায় যে, পাদ্রী মিশনারীদের প্রভাবের ফলে যদি আদিবাসীদের মনে কোন দৃষ্টিভঙ্গী বা যোগসূত্র তৈরী হবার সম্ভাবনা তৈরী হতো তা হতে পারতো খ্রীষ্টানদের ত্রিত্ববাদের বিশ্বাস। কিন্তু বড়ই আশ্চর্যের বিষয়, ধর্মীয় বিশ্বাস হিসাবে অষ্ট্রেলিয়ার এসব আদিবাসীদের কোথাও ত্রিত্ববাদের সামান্য কোন অংশেরও অনুপ্রবেশ ঘটে নি (no trace of trinity is found anywhere in the entire continent of Australia)। এর প্রতি কোন দুর্বলতাও আদিবাসীরা ব্যক্ত করে নি।

তবে Hovitt's-এর এ বক্তব্য থেকে যে যুক্তিসিদ্ধ সুপারিশ টানা যেত, তা জনসমক্ষে তুলে ধরার ব্যাপারে লেখককে কিছুটা যেন সংকুচিত বলে মনে হয়। অথচ ১৯০৪ সালে প্রকাশিত তার পুস্তকে তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন, আদিবাসীরা এক পরম পিতায় (All father) বিশ্বাস করে, যার গুণাবলীর উল্লেখযোগ্য হলো ঃ

"তিনি চিরন্তন, তাই সব কিছু শুরুর পূর্বেই তাঁর অস্তিত্ব ছিল এবং তিনি আজও বেঁচে আছেন। পাছে এ বক্তব্য থেকে খোদার ঐশী বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়ে পড়ে, তা এড়াবার লক্ষ্যে অথবা বিষয়টি কিছুটা তালগোল পাকাবার মানসে (confusing the issue) তিনি উল্লেখ করেন ঃ "এটা নজির হিসেবে খুব মূল্যবান হবার দাবী রাখে না। এজন্য যে, আদিবাসীরা কেউ সচেতনভাবে এ ধর্মীয় ধারণায় স্থিত হয় নি" (It cannot be alleged that these aborigines have consciously any form of religion)।

কিন্তু বিষয়টির গভীরে গিয়ে যে বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ ও যুক্তিভিত্তিক বিচারবুদ্ধি দ্বারা এসব বিবর্তনবাদীর পরিচালিত হওয়ার কথা ছিল, সেক্ষেত্রে Howitt সহ সকলেই ব্যর্থ হয়েছেন। যে প্রশ্নের সমাধান খোঁজা উচিত ছিল তা হলোঃ কীভাবে অসংখ্য গোত্র ও বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীর মাঝে যারা মূলত আদিবাসী ও পরস্পর থেকে যোগাযোগ ও ভাব বিনিময়ের সুবিধা বঞ্চিত, একই চিরন্তন খোদার ধারণা ও পথের সন্ধান পেল? (how could they conceive the some idea of one supreme Eternal Being independently?) উপরন্তু এ প্রেক্ষিতে তাদের তথাকথিত ব্যাখ্যা খোদার ধারণাটি মানুষের সমাজের ক্রমোন্নতির ধারায় বিকশিত হয়েছে- তারই বা বৈধতা কতটুকু? (what ligitimacy is left to their theories of an evolutionary development of the idea of God)।

Howitts এর উক্ত পুস্তক গভীরভাবে পরীক্ষা করলে আরো কিছু অসংগতি আমাদের চোখে পড়ে। যেমন, মানুষের মৃত্যু যদি জাদু বা কুহকের অপশক্তির প্রভাবে না হতো তাহলে আদিবাসীদের বিশ্বাস অনুযায়ী মানুষ বিবর্তনের মাধ্যমে ঈশ্বরে উপনীত হতো। (possible evolution of men into Gods)। আদিবাসী সমাজের এ বিশ্বাস বা অনুভূতি কোনক্রমেই এক পরমেশ্বরে উপনীত হওয়া যা বিবর্তনের মাধ্যমে ক্রমশ রূপ লাভ করেছে এর সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়। বড় জোর আদিবাসীদের এ চিন্তাধারা পুরাতন নিয়মে (old testament) বর্ণিত আদম হাওয়া ও সাপের ঘটনার (Story of Adam, Eve and the serpent) সাথে তুলনীয়। সাপ এই বলে আদমকে কুমন্ত্রণা দিয়েছিল ঃ জ্ঞান বৃক্ষের ফল খেলে আদম ও হাওয়া ঈশ্বরের মতই অমর হয়ে স্বর্গরাজ্যে অবস্থান করবে, আর এজন্যই ঈশ্বর উক্ত বৃক্ষের নিকটবর্তী না হওয়ার জন্য তাদেরকে শর্ত আরোপ করেন। আদিবাসীদের এ বিশ্বাসের মিল তাদেরকে বরং ইহুদী খ্রীষ্টীয় (Judeo christian beliefs) ধর্ম বিশ্বাসের কাছাকাছি নিয়ে আসে। আমরা ভেবে পাই না Howitts-এর মত একজন প্রজ্ঞাবান লেখক কীভাবে এ স্পষ্ট সামঞ্জস্য অনুধাবন করতে ব্যর্থ হন! (One really wonders how Howitt could fail to register this evident similarity)।

আমরা বলতে চাই, এটা একান্তই আদিবাসীদের নিজস্ব পদ্ধতি, এর আলোকে তারা স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাঝে একটি পার্থক্য রেখা টেনেছে, কিন্তু যেই অনুভূতি তারা এর মাধ্যমে ব্যক্ত করেছে তা খুবই সুস্পষ্ট। তাহলো এই যে, স্রষ্টা শুধু অতীতের বিবেচনায়ই শাশ্বত নন, তিনি ভবিষ্যতেও চিরঞ্জীব থাকবেন। এটা শুধু স্রষ্টারই বৈশিষ্ট্য। কেননা, কোন মানুষই ভবিষ্যতে অনন্তকাল বেঁচে থাকবে না, যেহেতু তারা প্রত্যেকেই মরণশীল। স্রষ্টা সম্পর্কিত আদিবাসীদের এ বিশ্বাস ইসলাম সহ অন্যান্য একেশ্বরবাদী ধর্মেরই অনুরূপ এবং তাদের সাথে একাত্ম হয়েই এ বিশ্বাস তারা করে যে, একমাত্র আল্লাহ্ই চিরন্তন-ইসলামের পরিভাষায় 'হাইয়ুন' ও কাইয়ুম'।

Howitts আদিবাসীদের এ বিশ্বাসকে ধর্মের সংজ্ঞায় আনতে চান না এ কারণেও যে, তাদের মাঝে উপাসনা বা কুরবানী করার কোন লক্ষণাদি তিনি দেখতে পান নি (There are no signs of worship or sacrifice among them)। সাধারণভাবে, ধর্মের বাহ্যিক দিকটিকে (face value) বড় করে দেখার জন্য এ ধরনের বিভ্রান্তি অনেক ঘটে থাকে। তাছাড়া দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, পাশ্চাত্যের অনেক মনীষীই আদিবাসীদের কিছু কিছু ধর্মীয় বিষয়কে পুরাপুরি ভুল বুঝেছেন (completely misunderstood)। উদাহরণস্বরূপ, তারা আদিবাসীদেরকে স্বপ্নচারী স্বভাবমন্ডিত (habit of dreaming) বলে যেভাবে বর্ণনা করেছেন, তা আসলে আদিবাসীরা স্বপ্নকে যে অর্থে বিশ্বাস করে তা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা (is not what the Aborigines themselves believe them to be)।

আমরা এ পর্যায়ে আদিবাসীদের স্বপ্নের প্রকৃত স্বরূপ নিয়ে দু'একটা কথা বলতে চাই। লেখকের সৌভাগ্য হয়েছিল আদিবাসীদের জনৈক প্রজ্ঞাবান নেতার সাথে এ বিষয়ে ভাব-বিনিময় করার, একটা সুযোগ সৃষ্টি করার। প্রথমে একজন আদিবাসী (non Aborigine) ব্যক্তির সাথে এ বিষয়ে আলাপ করতে অনীহা প্রকাশ করলেও যথাযথ মানসিক সম্পর্ক স্থাপনের পর (after a favourable rapport way established) তিনি এ বিষয়ে অত্যন্ত মূল্যবান তথ্য প্রদান করেন। আশ্চর্যের ব্যাপার যে, আদিবাসীদের অনুভূতিতে স্বপ্ন হচ্ছে খোদার পক্ষ থেকে মানুষের নিকট যোগাযোগের একটি মাধ্যম (a means of communication from God)। স্বপ্নের ভিতর দিয়ে তারা ভবিষ্যতের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সম্পর্কে অবহিত হয়ে থাকে। আর এ স্বপ্নের ব্যাখ্যাদানের জন্য তাদের কিছু ধর্মীয় গুরু (religious hierarchy) রয়েছে যারা বিশ্বস্ততার সাথে এ কাজ করে থাকে। এজন্য তাদের নেতাদের অনেকেই স্বপ্ন সংক্রান্ত ব্যাখ্যার ব্যাপারেও পারদর্শী বলে বিবেচিত হয় (well versed in the science of interpretation of dreams), (চলবে)।

সংক্ষিপ্ত ভাবানুবাদ - অধ্যাপক মোহাম্মদ আমীর হোসেন

যাকাত ও আল্লাহ্‌র পথে ব্যয়

(চতুর্থ কিস্তি)

জমির উৎপন্ন ফসলের নিসাব ও এর যাকাতের বিধান

ইসলামের আলেমগণ কৃষি জমিকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন। 'খারাজি' অর্থাৎ সেসব এলাকার জমি যার ওপরে মুসলমান তরবারীর বলে কব্জা করেছে কিন্তু সেখানে জমি সৈন্যদের মাঝে বন্টন করার পরিবর্তে সরকারের অধীনে রেখে দিয়েছে এবং চাষাবাদের জন্যে সেসব লোকদের দেয়া হয়েছে যারা এর ওপরে দখল স্বত্বেও মালিক বনে ছিল। এমন জমির শস্যের ওপরে যাকাতের পরিবর্তে খারাজ অর্থাৎ খাজানা ধার্য হবে। যার নিয়ম-নীতি অবস্থা ও সরকারের প্রয়োজনের দিক থেকে পরিবর্তিত হতে থাকে।

জমির দ্বিতীয় শ্রেণীকে 'উশরি' বলা হয়। যেমন হেজায অঞ্চলের জমি বা যেসব এলাকার জমি মুসলমান সৈন্যদের মাঝে বন্টন করে দেয়া হয়েছে আর তাদেরকে এর মালিক বানিয়ে দেয়া হয়েছে। এমন জমির উৎপাদনের ওপরে 'উশরি' অর্থাৎ $১/_{১০}$ ভাগ যাকাত হিসেবে দেয়া অবশ্য-কর্তব্য হবে। তবে শর্ত এই যে, বৃষ্টির ওপরে নির্ভরশীল হয় আর উৎপাদিত শস্য ৫ ওয়াসাক * (আনুমানিক ২১ মন) উৎপাদন যদি এথেকে কম হয় তাহলে এর ওপরে যাকাৎ ধার্য হবে না। অবশ্য উৎপাদন যদি ২১ মন বা এথেকে অধিক হয় তাহলে এর দশ ভাগের এক ভাগ যাকাত হিসেবে আদায় করতে হবে। জমিতে যদি কূঁয়ো বা খাল অথবা ঝরণার পানিতে সেচ দেয়া হয় তাহলে যাকাতের নিয়ম অর্ধ-দশমাংশ অর্থাৎ বিশভাগের এক ভাগ। এ যাকাত দেয়া তখন আবশ্যিক হবে যখন এ জমি থেকে সরকার খাজানা আদায় না করে। খাজানা যদি নিরূপিত হয়ে থাকে তাহলে পরে নীতিগতভাবে যাকাত দেয়া আবশ্যিক হবে না। কেননা একই জিনিষ থেকে দু'বার স্থায়ী ট্যাক্স আদায় করা যেতে পারে না।

যেভাবে প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে, নীতিগতভাবে জমির সেই ফসলের ওপরে যাকাত দিতে হবে যা মজুদ করা যায় যেমন, শস্য, শুকনো ফল যেমন, খেজুর, কিসমিস প্রভৃতি। কিন্তু যেসব ফসল মজুদ করা যায় না যেমন, সব্জী বা খরবুজা বা তাজা ফল প্রভৃতি তখন এগুলোর ওপরে যাকাত আদায় জরুরী নয়।

জমি যদি ভাগে দেয়া হয় তাহলে এজমালী ফসল থেকে যাকাত আদায় করতে হবে। এরপর জমির মালিক ও ভাগীদারের মাঝে অবশিষ্ট ফসল বন্টন করা হবে।

জংলী মধু, যার ব্যাপারে মৌমাছি পালনের জন্যে মানুষকে টাকা-পয়সা ব্যয় করতে হয় নি সেক্ষেত্রে ১০ মশক সমান আহরিত হলে এক মশক যাকাত হিসেবে অবশ্য-দেয় হবে। সুতরাং মধুর নিসাব ১০ মশক স্বীকার করা হয়। মৌমাছি পালনের মাধ্যমে যে মধু আহরিত হয় এর যাকাত নেই।

পশুর নিসাব ও যাকাত আদায়ের নিয়ম

যাকাতের পশু অর্থে গৃহপালিত পশু যেমন, উট, গাভী, মইশ, বলদ, ছাগল, ভেড়া, দুম্বা প্রভৃতি। ঘোড়া খচ্চর ও গাধার প্রসঙ্গে মতভেদ আছে। কোন কোন ফিকাহ্‌বিদ একে যাকাতের মাল হিসেবে গণ্য করেছেন আবার কেউ কেউ করেন নি। তদুপরি গৃহপালিত পশুর ওপরে তখন যাকাত অবশ্য-দেয় হবে যখন এরা প্রাকৃতিক চারণ ক্ষেতে চরবে ও লালিত-পালিত হবে এবং ঘরে তাদের খাবার সরবরাহ করার প্রয়োজন হবে না।

নিসাব

উটের যাকাতের নিসাব পাঁচ। কারও নিকট যদি ৫টি থেকে কম উট থাকে তাহলে এর ওপরে যাকাত অবশ্য-দেয় হবে না। এ প্রসঙ্গে যাকাতের বিস্তারিত নিয়মাবলী নিম্নরূপ ঃ

প্রতি ৫ থেকে ৯টি উটের যাকাত ১টি ছাগল বা এর সমমূল্য
" ১০ " ১৪" " " ২টি " "
" ১৫ " ১৯" " " ৩টি " "
" ২০ " ২৪" " " ৪টি " "
" ২৫ " ৩৫" " " ১ বছর বয়সের ১টি উট্‌নী বা সমমূল্য
" ৩৬" " " ৪৫" " " ২ বছর বয়সের ১টি উট্‌নী বা সমমূল্য
" ৪৬ " ৬০" " " ৩ বছর বয়সের ১টি উট্‌নী বা সমমূল্য
" ৬১ " ৭৫" " " ৪ বছর বয়সের ১টি উট্‌নী বা সমমূল্য
" ৭৬" " " ৯০" " " ২ বছর বয়সের ২টি উট্‌নী বা সমমূল্য
" ৯১" " " ১২০" " " ৩ বছর বয়সের ২টি উট্‌নী বা সমমূল্য

এর পরে অতিরিক্ত প্রতি ৪০টি উটের জন্যে দু'বছর বয়সের ১টি উটনী এবং ৫০টি উটের জন্যে ৩ বছর বয়সের ১টি উটনী যাকাত হিসেবে দিতে হবে।

গাভী ও মোষের যাকাত ঃ

গাভী ও মোষ একই শ্রেণীভুক্ত। আর এতে বলদ ও পুরুষ মোষও অন্তর্ভুক্ত। অতএব এদের নিসাব ও যাকাতের পরিসীমা এর সম্মিলিত সংখ্যার ওপরে নির্ণিত হয়। প্রত্যেক পশুর আলাদা আলাদা সংখ্যার ওপরে নয়; তা কোন একটির সংখ্যা নিসাবের সংখ্যা থেকে কম হোক না কেন। এসব পশুর (গাভী ও মোষ) যদি সম্মিলিত সংখ্যা নিসাবের সমান সমান হয় তাহলে যাকাত দেয়া অবশ্য-কর্তব্য। এরপরে যেখানে 'গাভী' শব্দ ব্যবহৃত হবে এতে গাভী, বলদ, পুরুষ মোষ ও স্ত্রী মোষ প্রভৃতি সবই অন্তর্ভুক্ত হবে।

গাভীর নিসাব ৩০টি। ৩০টির কম পশুর জন্যে যাকাত নেই। আর এসব জন্তুর যাকাতের নিয়ম প্রতি ৩০টি পশুর জন্যে এক বছর বয়সের একটি গাভী আর প্রতি ৪০টি পশুর জন্যে ২ বছর বয়সের একটি গাভী যেমন ঃ

প্রতি ৩০ থেকে ৩৯টি গাভী পর্যন্ত যাকাত হবে এক বছর বয়সের একটি গাভী বা এর সমমূল্য
" ৪০ " ৫৯" " " ১টি ২ বছর বয়সের গাভী বা এর সমমূল্য
" ৬০ " ৭৯" " " ১টি ২ বছর বয়সের গাভী বা এর সমমূল্য
" ৮০ " ৮৯" " " ২টি ২ বছর বয়সের গাভী বা এর সমমূল্য
" ৯০ " ৯৯" " " ৩টি ১ বছর বয়সের গাভী বা এর সমমূল্য
" ১০০ " ১০৯" " " ১টি ২ বছর বয়সের গাভী বা এর সমতূল্য
" ১১০ " ১১৯ " " " ২টি ২ বছর বয়সের গাভী ও ১টি ১বছর বয়সের গাভী বা এর সমমূল্য
" ১২০ " ১২৯" " " ৩টি ২ বছর বয়সের গাভী ও ৪টি ১বছর বয়সের গাভী বা এর সমমূল্য

আর এভাবে পরবর্তীগুলোর জন্যে হিসাব করতে হবে।

---

* টীকা ঃ ওয়াসাক এক প্রকার ওজনের মাপকাঠি। এক ওয়াসাক ৬০ সা' বা ১৬৫ লিটার। এ পরিমাপে গমের যে পরিমাণ হয় এদিক থেকে নিশ্চিতভাবে এর ওজন দাঁড়ায় এক ওয়াসাক = ৩ মন ১৯ সের ৫৯ তোলা ৫ মাশা ২ রতি। সা'এর পরিমাপের দ্বিতীয় গবেষণা অনুযায়ী এক ওয়াসাক ৩ মন ৭ সের ৫ তোলা (ইসলাম কা নেযামে মুহাস্‌সিল, পৃষ্ঠা ৯৯)।

ছাগল ভেড়ার যাকাত

ছাগল, ভেড়া বা এ জাতীয় পশু আর দুম্বা একই শ্রেণীতে গণ্য করা হয়। আর এদের নিসাব ও যাকাতের পরিসীমাও এদের সম্মিলিত সংখ্যার ওপরে নির্ধারিত হবে। পৃথক পৃথকভাবে প্রত্যেক পশুর ওপরে হবে না। পরে যেখানে 'ছাগল' শব্দ ব্যবহৃত হবে এতে ছাগল, পাঠা, ভেড়া, ভেড়ী, দুম্বা, দুম্বী সব অন্তর্ভুক্ত হবে।

ছাগলের নিসাব হলো ৪০টি। এর কম সংখ্যার জন্যে যাকাত দিতে হবে না। আর এগুলোর যাকাতের নিয়ম নিম্নরূপ ঃ

প্রতি ৪০ থেকে ১২০টি ছাগল পর্যন্ত যাকাত হবে ১টি ছাগল বা এর সমমূল্য

প্রতি ১২১ থেকে ২০০টি ছাগল পর্যন্ত যাকাত হবে ২টি ছাগল বা এর সমমূল্য

প্রতি ২০১ থেকে ৩০০টি ছাগল পর্যন্ত যাকাত হবে ৩টি ছাগল বা এর সমমূল্য

এর বেশি হলে প্রতি ১০০ ছাগলের জন্যে একটি ছাগল যাকাত দিতে হবে। ছাগলের সংখ্যা যদি একশ' পুরো না হয় বরং কম হয় তাহলে অংশের জন্যে কোন যাকাত ধার্য হবে না। অতএব ৩০১ থেকে ৩৯৯টি ছাগলের জন্যে যাকাত হবে ৩টি ছাগলই। অংশের প্রশ্নটি প্রত্যেক পশু-উট, গাভী প্রভৃতি সকলের নিসাবের বেলায় কার্যকরী হবে (ফিকাহ্ আহমদীয়া পৃষ্ঠা ৩৬২-৩৬৫)। (চলবে)

অনুবাদ - **মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান**

মু'মিনের বাইর এবং অভ্যন্তরীণ অবস্থা এক হতে হবে

ইলাহী জামাতে মু'মিন-মুত্তাকীদের মাঝে যে কোন ব্যাপারে আকস্মিক মত-পার্থক্য সৃষ্টি হতে পারে। আর এ মত-পার্থক্য নিরসনের দিক-নির্দেশনাও কুরআন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। এক কথায় আল্লাহ্ এবং রসূলের (সঃ) নির্দেশিত পথেই সবাইকে চলতে হবে এবং জটিলতম সমস্যার সমাধান খুঁজতে হবে। মতবিরোধ ও মত-পার্থক্য সৃষ্টি হলে তাৎক্ষণিকভাবে দোয়ার মাধ্যমে ইসলামী জামাতের প্রশাসনিক সহায়তায় সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে আলোচনার টেবিলে বসে তা নিরসনের চেষ্টা করতে হবে। স্থানীয় ও জাতীয়ভাবে ব্যর্থ ও বিফল মনোরথ হলে নবুওয়তের তরীকায় প্রতিষ্ঠিত ঐক্য খিলাফতের হস্তক্ষেপে বিবাদ বিসম্বাদ-এর মীমাংসা করতে হয়। ধর্মীয় ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ নিয়েও খুঁটি-নাটি ব্যাপারে সংকট সৃষ্টি হলে এবং মত-পার্থক্য দেখা দিলে তড়িৎ গতিতে ফেৎনা-ফাসাদ সৃষ্টি না করে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সঠিক সমাধানে উপনীত হতে হবে। মু'মিনদের মাঝে মত-বিরোধ, চুল ছেঁড়াছিড়ি, কাদা ছুঁড়াছুড়ি, গিবত বা পরনিন্দা, পরচর্চা, আত্মম্ভরিতা, অহংবোধ, মতভেদ ও মত-পার্থক্য প্রভৃতি নৈতিকতা বর্জিত অনৈসলামিক কার্যকলাপ ও কদাচার মাথা চাড়া দিয়ে উঠলে বিপর্যয়কর পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে। এক্ষেত্রে সম্মানিত আমীর, প্রেসিডেন্ট, কায়েদ ও অন্যান্য ওহদাদারগণ নিশ্চুপ হয়ে বসে থাকতে পারেন না। দ্রুত পতিতে সংকটময় পরিস্থিতিতে দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ।

সামান্যতম ব্যাপারে সংকটময় পরিস্থিতির উদ্ভব হলে আমরা স্থানীয় এবং জাতীয়ভাবে তা সমাধান করি না। বরং খলীফা মহোদয়কে প্রকৃত ঘটনা জানিয়ে তাঁর নিকট থেকে সমাধান প্রত্যাশা করি। একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রে মহামান্য খলীফার অনুমোদিত আমীর যেখানে বিদ্যমান রয়েছে। আমরা তাকে ক্ষেত্র বিশেষে অবজ্ঞা, অবহেলা ও উপেক্ষা করছি।

ইলাহী জামাতে যারা নেতৃত্ব লাভের সুযোগ পেয়েছেন তারা বড়ই সৌভাগ্যবান। কিন্তু নেতৃত্ব লাভের সুযোগ পেয়ে অনেকে এমনসব কাজ করেন যার ফলে মহামান্য খলীফাকে হস্তক্ষেপ করে নেতৃত্বের পরিবর্তন সময়ে সময়ে ঘটাতে হয়। এ রকম ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটুক তা কেউ চায় না। আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যে একনিষ্ঠভাবে কাজ করে যেতে হবে।

সমগ্র বিশ্ব জাহানের মহামান্য খলীফাকে খুঁটিনাটি ব্যাপারে অবহিত করে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলা সমীচীন হবে কিনা তা একবার ভেবে দেখা দরকার। বিশ্বের প্রায় ২০ কোটি আহমদীকে নিয়ে প্রতিনিয়ত যাকে ভাবতে হয় তাঁকে কোন বিষয়ে জানাবার আগে তাঁর পদমর্যাদার কথা ভুলে গেলে হবে না। স্থানীয় এবং জাতীয়ভাবে কোন সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান হলে এবং সৃষ্ট বিবাদ-এর মীমাংসা হলে তা যুগ-খলীফার দপ্তর পর্যন্ত গড়াতে পারে না। আমাদের সম্মানিত আহমদী মুসলমান ভাই-বোনেরা অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করলে নিশ্চয় সমাধানের পথ খুঁজে পাবেন।

কাজেই বাঙালী আহমদী মুসলমানদের নৈতিক চারিত্রিক মান আরো সমুন্নত হতে হবে। তারা উন্নত মনমানসিকতার অধিকারী হলে জাতি প্রভূতভাবে উপকৃত হবে এবং তৃণমূল পর্যায়ে তাদের দ্বারা সত্যের আলো ছড়িয়ে পড়বে। বলা আবশ্যক যে, যারা সমাগত সত্যের বাণী ছড়িয়ে দিবে তারা যদি পূত-পবিত্র পরিশ্রুত ও নিষ্কলুষ না হয় তাহলে ইসলামের প্রচার করবে কে? নৈতিক অবক্ষয় রোধ করতে না পারলে ইলাহী জামাত থেকে ছিট্কে পড়তে হবে। অধঃপতিত মানুষের জন্য সত্যের প্রচার রুদ্ধ হবে না।

ইসলামে আহমদীয়া আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) এবং যথাক্রমে পাঁচ জন খলীফার পূত-পবিত্র জীবন আমাদের সম্মুখে খোলা পুস্তকের ন্যায় বিদ্যমান। যে কেউ তাঁদের জীবনাদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে আলোকিত পথে চলতে পারে। আহমদীয়ত একটি অনির্বাণ চিরন্তন শিখা। যার জ্যোতিস্ফূরণে আজ সমগ্র বিশ্ব আলোকিত। তাইতো ইসলামের সত্যতায় মুগ্ধ হয়ে মানুষ দ্রুত আহমদীয়া (ঐশী) খিলাফতে শামিল হচ্ছে। ইসলামের প্রচার ও প্রসারতায় সবাইকে মত পার্থক্য ভুলে (আপন সহোদর ভাইয়ের মত) ঐকমত্যে উপনীত হয়ে ব্রতী হতে হবে। ইসলামের বিশ্ব বিজয়াভিযানে শামিল হওয়া সবার জন্যে অপরিহার্য।

প্রশংসা করা হলেও কাজের স্বীকৃত দেয়া হলে স্বভাবতই মানুষ-ব্যক্তি অনুপ্রাণিত হয়। আর ভর্ৎসনা ও নিন্দা করা হলে উৎসাহ-উদ্দীপনা ও কর্মস্পৃহা হ্রাস পেতে পারে। আমাদের প্রাণ প্রিয় খলীফা মহোদয় যুক্তরাজ্যের ৩৭তম জলসায় তাঁর প্রদত্ত ভাষণে বিভিন্ন জামাতের কর্মতৎপরতার বর্ণনা প্রদান করেছেন। এতে জামাতগুলোতে আরো কর্মস্পৃহা ও গতিময়তা যে সঞ্চারিত হবে তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। "অনেক ব্যক্তি এরূপ আছে, যারা বাহ্যতঃ ধৈর্যশীল, কিন্তু অভ্যন্তরে ব্যঘ্র স্বভাব-বিশিষ্ট। অনেকে এরকম আছে যারা বাহ্যতঃ সুশীল, কিন্তু অভ্যন্তরে অতি কুটিল।" বলা হয়েছে, "তোমরা কখনও তাঁর নিকট গ্রহণীয় হবে না যে পর্যন্ত তোমাদের বাহির এবং অভ্যন্তরীণ অবস্থা এক না হয়।" হযরত মসীহ্ মাওউদ

(আঃ) আরো বলেন, “বড় হলে ছোটকে লাঞ্ছনা দিবে না বরং তার প্রতি সর্বদা দয়া করবে। যদি বিদ্বান হও তবে বিদ্যাহীনকে নিজের বিদ্যার অহংকারে অবমাননা না করে তাকে সদুপদেশ দিবে। যদি ধনী হও তবে আত্মাভিমানে দরিদ্রের উপর গর্ব না করে তাদের সেবা করবে। ধ্বংসের পথ থেকে সাবধান থাকবে।” (দ্রঃ কিশ্‌তিয়ে নূহ গ্রন্থ)

ইসলামে আহমদীয়া আন্দোলনের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা বলেছেন, “তোমরা অহংকার থেকে বাঁচিও কেননা, আমাদের মহা প্রতাপশালী খোদার দৃষ্টিতে অহংকার অত্যন্ত ঘৃণ্য। ... প্রত্যেক এমন ব্যক্তি অহংকারী যে নিজ ভাইকে এজন্য অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখে যে, যে তার থেকে বেশি জ্ঞানী অথবা বুদ্ধিমান অথবা কর্ম কুশলী কেননা সে খোদাতাআলাকে বুদ্ধি ও জ্ঞানের উৎস মনে করে না, বরং নিজেকে কিছু একটা মনে করতে থাকে। খোদা কি তাকে উন্মাদ করে দেয়ার শক্তি রাখেন না? আর তিনি তার সেই ভাইকে যাকে সে হেয় মনে করে থাকে তা হতে বুদ্ধি-জ্ঞান ও কৌশলের আধিক্য দান করতে পারেন না? এমনিভাবে সেই ব্যক্তিও যে নিজে ধন-দৌলত ও ঐশ্বর্যের দরুন নিজ ভাইকে নগণ্য মনে করে থাকে সেও অহংকারী কেননা, সে এটা ভুলে যায় যে, এই সম্মান ও ঐশ্বর্য খোদাই তাকে দান করেছেন। সে অন্ধ যে জানে না যে, খোদাতাআলা তার উপর এমন বিপদ অবতীর্ণ করার শক্তি রাখেন যার দরুন সে নিম্নস্তরে নিপতিত হতে পারে এবং তার সেই ভাইকে, যাকে সে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখেছিল তা হতে উত্তম ধন-দৌলত দান করতে পারেন। এমনিভাবে সেই ব্যক্তি যে তার সুস্বাস্থ্যের জন্য গৌরব করে থাকে অথবা নিজ সৌন্দর্য, গুণাবলী ও শক্তির জন্য ঈর্ষা করে নিজ ভাইয়ের ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে, সে-ও অহংকারী। সে তো খোদা হতে অজ্ঞ যিনি তার উপর এমন শারীরিক ত্রুটি অবতীর্ণ করে তাকে সেই ভাই হতে খারাপ অবস্থায় নিপতিত করতে পারেন” [হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) প্রণীত পুস্তাকাদি হতে নির্বাচিত কতিপয় উদ্ধৃতি পৃঃ ১২]।

“কুৎসা রটনা করা এক জঘন্য পাপ যা ঈমানকে ধ্বংস করে দেয়, সত্য হতে অনেক দূরে নিয়ে যায় এবং বন্ধুত্বকে শত্রুতায় পরিণত করে দেয়। সিদ্দিকীয়তের মর্যাদা লাভের জন্য কুৎসাকে পরিহার করা আবশ্যক। ... খোদাতাআলা যেন এরূপ ব্যভিচার থেকে রক্ষা করেন। ... ইহা অত্যন্ত ভয়ানক আধ্যাত্মিক ব্যাধি যা ধীরে ধীরে আক্রান্তকারীকে ধ্বংস করে দেয়া” (দ্রঃ মালফূযাত ঃ ১ম খন্ড, ৩৫৬ পৃঃ)।

প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) বলছেন, তোমরা একে অপরের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করো না। তোমরা আল্লাহ্‌র বান্দা ভাই ভাই হও। মুসলমানগণ পরস্পর ভাই ভাই এবং সে যেন তার উপর নির্যাতন না করে এবং তাকে অপদস্থ না করে। কারও নিজ মুসলমান ভাইকে অবজ্ঞা করাই অনিষ্টের জন্য যথেষ্ট। (মুসলিম)। মহানবী (সঃ) বলেছেন, হিংসা হতে সাবধান থেকো। কারণ আগুন যেমন কাঠ খড়কে ভক্ষণ করে সেরূপে হিংসা পুণ্যকে ভক্ষণ করে ফেলে (আবূ দাউদ, কিতাবুল আদাব)। বলা হয়েছে, যার হৃদয়ে বিন্দুমাত্র অহংকার করছে সে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করবে না। সত্যকে পরিহার এবং মানুষকে ঘৃণা করার মাঝেই অহংকার নিহিত (মুসলিম, কিতাবুল ঈমান)।

“মহান আল্লাহ্‌ কোন দাম্ভিক ও অহংকারীকে পসন্দ করেন না। খোদাতাআলার প্রকৃত (সৎ ও আদর্শবাদ) বান্দা তারাই যারা ভূ-পৃষ্ঠের উপর নম্র হয়ে চলে, এবং যখন অজ্ঞরা তাদেরকে সম্বোধন করে। তখন তারা কোন বিবাদ না করে বলে ‘সালাম” (আল্‌ ফুরকান - ২৫ঃ৬৪)। কুরআন মজীদে আল্লাহ্‌ বলেন, “এবং তুমি লোকের সম্মুখে অবজ্ঞাভরে গাল ফুলিও না। এবং ভূপৃষ্ঠে অহংকারের সাথে চলো না। কোন দাম্ভিক, অহংকারীকে আল্লাহ্‌ আদৌ ভালবাসেন না। এবং তুমি নিজ চাল-চলনে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করো। এবং নিজ কণ্ঠস্বরকে মৃদু রাখো, নিশ্চয় সকল কণ্ঠ স্বরের মধ্যে গর্দভের কণ্ঠস্বর সর্বাধিক কর্কশ” (সূরা লোকমান ৩১ঃ১৯,২০)।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌ রাবে’ (রাহেঃ) বলেছেন, “ইসলাম মুসলমানদের মাঝে যে ধরনের চরিত্র সৃষ্টি করতে চায় তা এমনিতেই স্বয়ং দায়িত্বহীন আচরণ ও অপরাধ প্রতিহত করে। ইসলাম এমন এক প্রকার সুস্থ যমীন সৃষ্টি করে যা আদতেই জীবাণু ও আগাছার বৃদ্ধি নাশ করে” (বিশ্ব শান্তি ঃ সমকালীন সমস্যাবলীর ইসলামী সমাধান ১১৬ পৃঃ)।

কুরআন মজীদে ইরশাদ হচ্ছে, “হে মানব মন্ডলী! নিশ্চয় আমরা তোমাদের এক পুরুষ ও নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি এবং বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত করে দিয়েছি যেন তোমরা একে অপরকে চিনতে পারো; নিশ্চয় আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে তোমাদের মাঝে সর্বাধিক সম্মানিত সে ব্যক্তি, যে তোমাদের মাঝে সর্বাধিক মুত্তাকী (আল্‌ হুজুরাত - ৪৯ঃ১৪)। সমসমায়িক যামানাকে যে সকল অভিশাপ জরাকীর্ণ করে ফেলেছে। তার মাঝে জাতি ভেদ প্রথা এমন একটা অভিশাপ যা পৃথিবীর বুকে শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সব চাইতে মারাত্মক বিপদের সৃষ্টি করে রেখেছে। আল্লাহ্‌ বলেন, হে যারা ঈমান এনেছ! কোন জাতি যেন অন্য কোন জাতিকে হাসি-বিদ্রূপ না করে, তারা ওদের চাইতে উত্তম হতে পারে এবং নারীরাও যেন অন্য নারীদেরকে হাসি -বিদ্রূপ না করে। তারা ওদের চাইতে উত্তম হতে পারে। এবং তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না। এবং একে অপরকে অবজ্ঞাসূচক উপনাম দিয়ে ডেকো না। ঈমান আনার পর দুষণীয় নাম (দ্বারা অভিহিত হওয়া) বড়ই মন্দ বিষয়। এবং যারা এরপর তওবা করতে না, তারাই যালেম” (আল্‌ হুজুরাত - ৪৯ঃ১২)।

নবী-রসূল এবং তাঁদের স্থলাভিষিক্ত খলীফাগণের দ্বার সবার জন্যেই উন্মুক্ত। হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর পূর্বে অগণিত নবী-রসূল আবির্ভূত হয়েছেন। আল্লাহ্‌ বলেন, নিশ্চয় আমরা তোমাকে সত্য সহকারে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি; এবং এমন কোন জাতি নেই যার নিকট সতর্ককারী আগমন করে নি” (আল্‌ ফাতির - ৩৫ ঃ ২৫)। পূর্ববর্তী নবী-রসূলগণ সুনির্দিষ্ট জাতি গোষ্ঠী ও গোত্রের মাঝে আবির্ভূত হয়েছিলেন। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বৃহত্তর পরিসরে তাদের কোন কম দায়-দায়িত্ব ছিল না। কিন্তু ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-কে পৃথিবীর সকল মানুষের জন্যে প্রেরণ করা হয়েছে। তাঁকে সাদরে গ্রহণ বরণ করে নেয়ার মাঝেই মানুষের প্রকৃত কল্যাণ ও মঙ্গল নিহিত রয়েছে। মুহাম্মদী নবুওয়ত ব্যতিরেকে মানুষের হেদায়াতের জন্যে আর কোন ব্যবস্থা ও পদ্ধতি নেয়। তাই সবাইকে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে সুশৃঙ্খলভাবে জীবন নির্বাহ করতে হবে। এখানে বাঁধন হারা-ভাবে জীবন নির্বাহ করার কোন সুযোগ নেই।

মহানবী (সঃ)-এর তিরোধানের পর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী নবুওয়তের পদ্ধতিতে খিলাফত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। হযরত আবূ বকর (রাঃ) হযরত

উমর (রাঃ), হযরত উসমান (রাঃ) ও হযরত আলী (রাঃ)-এর গতিশীল নেতৃত্বে ইসলামের প্রচার কার্যক্রম সচল ও সক্রিয় ছিল। ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ত্রিশ বছরের মাঝে ইসলামী খিলাফত কর্তিত হয়ে যায়। আবূ দাউদ হাদীসের বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী প্রত্যেক হিজরী শতাব্দীর শিরোভাগে মুজাদ্দেদ ধর্ম সংস্কারকগণ আবির্ভূত হন। ত্রয়োদশ হিজরী শতাব্দী পর্যন্ত মুজাদ্দিদগণ ধারাবাহিকভাবে আবির্ভূত হয়েছেন। কিন্তু চতুর্দশ হিজরী শতাব্দীতে যিনি মুজাদ্দিদ হিসাবে আগমন করবেন তিনি একাধারে প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহ্দী (আঃ) বলেও গণ্য হবেন। হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ) অসাধারণ গুণাবলীসম্পন্ন ও বিশেষ পদমর্যাদার অধিকারী হবেন। তিনি নবী ঈসার গুণাবলী সম্পন্নই হবেন না বরং তার শুভাগমন মহানবী (সঃ)-এর দ্বিতীয় আবির্ভাবরূপে আখ্যায়িত হবে। হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ) নবী করীম (সঃ)-এর প্রেমে বিভূষিত তাঁরই শ্রেষ্ঠ অনুগত উম্মত এবং তাঁর উচ্চতম প্রশংসা কীর্তনকারী হবেন।

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর শিরোভাগে আগমনকারী ইমাম মাহ্দী ও প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আঃ) হওয়ার দাবী করেছেন। তিনি ব্যতিরেকে অন্য কেউ যথাসময়ে মাহ্দী ও মসীহ্ হওয়ার দাবী করেন নি। কাজেই নির্ধারিত সময়ে আগমনকারী ইমাম মাহ্দী ও প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আঃ)-কে গ্রহণ-বরণ করে নেয়াটাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ।

ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর মৃত্যুর পর ১৯০৮ইং সনের ২৭ তারিখ নবুওয়তের পদ্ধতিতে পুনরায় ইসলামী খিলাফত ব্যবস্থা কায়েম হয়। এ পর্যন্ত ধারাক্রমে পাঁচজন খলীফা যেমন হযরত হাকীম নূরুদ্দীন (রাঃ), হযরত মির্যা বশীর উদ্দিন মাহমুদ আহমদ (রাঃ), হযরত মির্যা নাসের আহমদ (রহঃ), হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহেঃ) ও বর্তমান খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আইঃ)-এর গতিশীল নেতৃত্বে আহমদী জামাত পরিচালিত হয়েছে এবং হচ্ছে। উন্নতি ও অগ্রগতির ধারা বেগবান করে বিশ্বব্যাপী ইসলামে আহমদীয়া আন্দোলন দ্রুতগতিতে প্রসার লাভ করছে। অত্যন্ত সুচারুরূপে ও সুনিয়ন্ত্রিত উপায়ে ঐশী জামাত কর্তৃক বিশ্বময় ইসলাম প্রচার কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমানে ইসলামী খিলাফতের ব্যবস্থায় এক নবধারার শুভ সূচনা হয়েছে। ইসলামে আহমদীয়া খিলাফত ঐশী নিদর্শনের প্রকৃষ্ট প্রমাণ বহন করছে। একজন খলীফার ইনতেকালের পর আর একজন খলীফা খিলাফতের মসনদে সমাসীন হয়েছেন। কিন্তু আহমদীয়া আন্দোলনের অগ্রগতি তাতে ব্যাহত হয় নি। বরং দুনিয়াব্যাপী বিস্তৃত আহমদী জামাত অসাধারণ সফলতা উন্নতি ও অগ্রগতি অর্জন করে চলেছে। প্রত্যক খলীফার জামানাতেই এ জামাত বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছে সত্য, কিন্তু এতদ্সত্ত্বেও আহমদীয়া আন্দোলনের ক্রমোন্নতির ধারা ব্যাহত হয় নি। বৈজ্ঞানিক উন্নতি অগ্রগতি উৎকর্ষ ও ক্রমোন্নতির এ স্বর্ণময় যুগে আহমদীয়া মুসলিম জামাত দুনিয়াব্যাপী বিস্তার লাভ করেছে এবং অসাধারণ সফলতা অর্জন করে এগিয়ে চলেছে। ইলেকট্রিক মিডিয়া ও প্রিন্ট মিডিয়ার দ্বারা আহমদীয়া জামাতের প্রচেষ্টায় ইসলাম প্রচারে এক নবদিগন্তের শুভ সূচনা হয়েছে। বিভিন্ন দেশে নতুন বই-পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা প্রকাশের ফলে প্রকাশনা ক্ষেত্রেও পরিবর্তনের নব ধারা সূচিত হয়েছে। কাজেই সকল খোদ্দাম, আতফাল, আনসার, লাজনা ও নাসেরাতকে সুশৃঙ্খলভাবে ধারাক্রমে যুগ খলীফা, আমীর, সদর, প্রেসিডেন্ট, কায়েদ, যয়ীমে আলার নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে প্রগতির পথে চলতে হবে।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ খামেস (আইঃ) বলেন, "আমাদের সমস্ত উন্নতির ভিত্তি খিলাফতের সাথে দৃঢ় সম্পর্কের মাঝে নিহিত। খিলাফতের প্রতি আনুগত্যকে স্থায়ী রূপ দিন। আল্লাহ্‌র এ রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরুন। বেশি বেশি দোয়া করতে থাকুন আর প্রমাণ করে দিন চিরকালের মত আজও কুদরতে সানীয়া এবং গোটা জামাত এক ও অভিন্ন অস্তিত্বে আর চিরকাল অভিন্নই থাকবে, ইনশাআল্লাহ্। কুদরতে সানীয়া (দ্বিতীয় কুদরত) আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে একটি বড় পুরস্কার। এর উদ্দেশ্য হ'ল জাতিকে একত্র করা এবং বিভক্তির হাত থেকে রক্ষা করা। এ সেই মালা যার মাঝে (ইসলামী) জামাত মণি-মুক্তার মত গেঁথে রয়েছে। মণি-মানিক্য বিক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকলে নিরাপদ থাকে না। আর দেখতেও সুন্দর লাগে না। মালায় গাঁথা মণি - মুক্তা দেখতেও সুন্দর আর থাকেও নিরাপদ। কুদরতে সানীয়ার বিকাশ না ঘটলে শাশ্বত সত্য ধর্ম কখনও উন্নতি করতে পারত না। যুগ ইমামের সাথে গভীর সম্পর্কের মাঝেই সকল কল্যাণ নিহিত। আর তিনিই সব ধরনের ফিৎনা ও পরীক্ষায় আপনার জন্য ঢাল হয়ে থাকেন। আপনারা উন্নতি করতে চাইলে আর পৃথিবীতে বিজয়ী হতে চাইলে খিলাফতের সাথে দৃঢ়ভাবে সম্পৃক্ত হয়ে যান। আল্লাহ্ আপনাদের সবার রক্ষক ও সাহায্যকারী হোন।" [বিশেষ বাণী ঃ (সংক্ষেপিত) আন্ নূর ২৫/৭/০৩]

আমাদের জাতীয় আমীর মোহতরম মোবাশ্‌শের উর রহমান বলেছেন, "বাংলাদেশের আহমদী ভাই-বোনদের কাছে আমার প্রত্যাশা থাকবে, বর্তমান সময়ের সবচেয়ে বড় চাহিদা হচ্ছে আমাদের জামাতের যথাযথ তা'লীম ও তরবিয়ত। প্রতিটি আহমদী ঘর যদি এ তা'লীম তরবিয়তের এক একটি অক্ষত দূর্গ হিসেবে কাজ করতে পারে তাহলে বাড়তি পাওনা হিসেবে আমরা তবলীগেরও একটা বিরাট অংশকে অর্জন করতে পারবো- সে কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। তার মতে মতামতের ভিন্নতা থাকা স্বাভাবিক। সুতরাং অন্যের মতামতের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধাবোধ রেখে আমরা সকলে যেন ঐক্যবদ্ধ হয়ে তা'লীম, তরবিয়ত ও তবলীগের কাজ করতে পারি সেজন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে"। তিনি বলেন, "আমরা যে যেখানেই থাকি না কেন একটি সুন্দর মনের আহমদী হিসেবে যেন নিজেদের পরিচয়কে নিজেদের পরিবেশে তুলে ধরতে পারি, কখনও এ চেষ্টার ত্রুটি যেন না করি।"

ন্যাশনাল আমীরের আন্তরিক আহবানে সাড়া দেয়া প্রতিটি বাঙালী আহমদী মুসলমানের উচিত। এখন পঞ্চম খিলাফত কাল চলছে। কাজেই হাত পা গুটিয়ে বসে না থেকে ইসলামের বিশ্ব বিজয় অভিযানে শামিল হওয়া একান্ত প্রয়োজন। ইসলামী খিলাফতের প্রতি আনুগত্যকে যে কোন মূল্যে স্থায়ী রূপ দিতে হবে।

- আমীর মাহমুদ ভূঁইয়া

বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা

আমরা আমাদের অগণিত পাঠক-পাঠিকা, বিজ্ঞাপণদাতা, লেখক-লেখিকা ও শুভানুধ্যায়ীগণকে জানাই মহান বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা।

-নির্বাহী সম্পাদক

সিঙ্গাপুরে আহমদীয়ত

মূল ঃ মোকার্‌রম মাওলানা সিদ্দীক গুরুদাসপুরী সাহেব

[১৯৯৮ সনের জুন মাসে আমাকে আমেরিকা যেতে হয়। যাবার সময় এবং সেখান থেকে ফেরার পথে সিঙ্গাপুরে কয়েকদিন অবস্থান করার সুযোগ হয়। আমার সঙ্গে আমার স্ত্রী এবং আমার এক মেয়েও ছিল। সেই শহরটি কেমন দেখলাম এবং আহমদীয়া জামাতের সদস্যগণের মাঝে যে নিষ্ঠা, মহব্বত এবং আহমদীয়তের সঙ্গে সম্পৃক্ততা দেখলাম তা ভাইবোনদের সামনে সংক্ষেপে উপস্থাপন করছি; বিশেষ করে সিঙ্গাপুরের স্মরণীয় দিকগুলো উল্লেখ করাই আমার উদ্দেশ্য]

সফরের বিবরণ ঃ

১৯৯৮ সনের জুন মাসে সিঙ্গাপুরের এয়ার লাইনসের মাধ্যমে আমেরিকার পথে যাত্রা করি। ইতোমধ্যে সিঙ্গাপুর জামাতকে অবহিত করা হয়েছিল। আমরা যখন এয়ারপোর্টের বাইরে আসি তখন সিঙ্গাপুর জামাতের প্রেসিডেন্ট মোকররম আব্দুল আযীম সাহেব, মোকাররম শমশের আলী সাহেব, মুরব্বী সিলসিলাহ্, যিনি ইন্দোনেশিয়ার অধিবাসী এবং আরো কয়েকজন বন্ধু এবং লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র সদস্যগণ এয়ারপোর্টে উপস্থিত ছিলেন। তারা অত্যন্ত ভালবাসার সাথে আমাদেরকে অভ্যর্থনা জানান। তাঁদের সঙ্গে আমরা আহমদীয়া মিশন হাউসে যাই এবং সেই দিনই বিকাল পাঁচটায় আমেরিকার পথে যাত্রা করার কথা। যেহেতু সেখানে মাত্র কয়েক ঘন্টার অবস্থান, এরই সুবাদে জামাতের পক্ষ থেকে সম্মিলিত খাওয়ার ব্যবস্থা করে রাখা ছিল। সকলেই অংশ্রগহণ করেন। মহিলাদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা ছিল।

আহমদীয়া জামাতের মাঝে যেরূপ ভ্রাতৃত্বসুলভ সম্পর্ক এবং ভালবাসা খোদাতাআলা প্রতিষ্ঠা করে রেখেছেন তা সিঙ্গাপুরের আহমদীয়া জামাতের পক্ষ থেকে প্রকাশিত হচ্ছিল। আহমদী মহিলারা জামাতী পরিবেশ প্রসঙ্গে কতক প্রশ্ন রাখেন। যথারীতি সেগুলোর জবাব দেয়া হয়। এরপর মোকাররম শমসের আলী সাহেবের সঙ্গে শহরের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলো ঘুরে দেখি। মসজিদে সুলতান নামে একটি মসজিদ রয়েছে, সেটিও দেখলাম। এখান থেকে মোকাররম মাওলানা গোলাম হোসাইন আইয়াজ সাহেবকে অমানবিকভাবে ধাক্কা মেরে জানালা দিয়ে বাইরে ফেলে দিয়েছিল। যুহর-আসর নামায আদায় করে সকলকে নিয়ে দোয়া করে তিনটার সময় এয়ারপোর্টের দিকে যাত্রা করি। প্রায় সাড়ে তিন ঘন্টার রাস্তা অতিক্রম করে হংকং গিয়ে পৌছি। আর এক ঘন্টা অপেক্ষা করার পর পরবর্তী স্টেশন সানফ্রান্সিসকো যাত্রা করি এবং সাড়ে ১৩ ঘন্টা আকাশে উড়ে সেই দিন সন্ধ্যা ৭টার সময় সানফ্রান্সেসকো গিয়ে পৌছি।

এখানে উল্লেখ থাকে, সানফ্রান্সিসকো এবং সিঙ্গাপুরের মাঝে ১৫ ঘন্টা সময়ের ব্যবধান। সেজন্য বিমান ১৩ই জুনের বিকাল পাঁচটায় সিঙ্গাপুর থেকে যাত্রা করে। আর ১৩ তারিখেই বিকাল দু'টার সময় সানফ্রান্সিসকোতে পৌছে যায়। সেখানে নাসিরের পরিবারবর্গ এবং স্নেহের মোহাম্মদ জহীর এবং নাসের উপস্থিত ছিলেন। তারা দু'জনেই সালানা জলসায় যোগদানের জন্য যাচ্ছিল। জামাতে আহমদীয়া আমেরিকা সকল দেশ থেকে প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য আমন্ত্রণ পত্র প্রেরণ করেছিল। এতে পাকিস্তানও অন্তর্ভুক্ত ছিল। হুযূর (রাহেঃ) আমাকে তাহ্‌রীকে জাদীদের পক্ষ থেকে পাকিস্তানের প্রতিনিধি নিয়োগ করে ছিলেন। ২৩শে জুন সানফ্রান্সিসকো থেকে যাত্রা করি এবং এক রাত্রি সিকাগোতে কাটানোর পর জুনের ২৫ তারিখ সন্ধ্যায় গিয়ে পৌছি। তারপর তিন দিন বাল্টিমোড় সালানা জলসায় যোগদান করি এবং হুযূর (রাহেঃ)-এর সঙ্গে সাক্ষাত লাভের পর ৩০শে জুন প্রত্যাবর্তন করে সানফ্রান্সিসকোতে পৌছি।

১৯৯৮ সনের ১৩ই সেপ্টেম্বর আমেরিকা থেকে আমাদের ফেরার কথা। সিঙ্গাপুর জামাতের প্রেসিডেন্ট মোকাররম আবদুল আযীম সাহেবকে পূর্বেই জানানো হয়েছিল। সুতরাং তিনি জামাতের সদস্যবৃন্দ সহ এয়ারপোর্টে উপস্থিত ছিলেন। এয়ারপোর্টে উপস্থিত সদস্যগণের সাথে সিঙ্গাপুর মিশন হাউসে যাই। তিন দিন সিঙ্গাপুর অবস্থান করি। সেখানকার জামাতের সদস্যগণের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ হয়। মোকাররম মাগফুর আহমদ সাহেব এবং আহমদ সাহেব উপস্থিত থাকেন। তাদের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করেন, জাযাহুমুল্লাহ্।

সিঙ্গাপুর ঃ

মোকাররম শমসের আলী সাহেব (মুরব্বী সিলসিলাহ্) এর সঙ্গে সেই সুন্দর শহর ভ্রমণ করি।

এর কিছু বিবরণ নিম্নরূপ।

সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়ার উত্তরে অবস্থিত এবং প্রায় সাড়ে ছয় হাজার বর্গ মাইলের একটি শহর। লোক সংখ্যা প্রায় তিন মিলিয়নের কাছাকাছি। শতকরা ৭৫ ভাগ চীনা। বাকী মালাই, হিন্দুস্থানী, পাকিস্তানী এবং ইউরোপবাসী।

এ শহরে ১৮১৯ সনে বৃটিশ ইষ্টইন্ডিয়া কোম্পানীর এজেন্ট Sriford Refbess ব্যবসায় কেন্দ্র স্থাপন করেন। এরপর ১৯২৪ সনে সুলতান জুহু এ শহরটি ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কাছে হস্তান্তর করে এবং ১৯২৬ সনে স্থায়ীভাবে বৃটিশ শাসনাধীনে নিয়ে যায়। ১৯৪২ সনে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় শহরটি জাপানের অধীনে চলে যায়।

১৯৪৫ সনে পুনরায় বৃটিশ দ্বিতীয়বার আয়ত্তে নিয়ে আসে। এমন কি ১৯৬৫ সনে একটি স্বাধীন সার্বভৌম গণতান্ত্রিক দেশে পরিণত হয়। এর নেতৃত্ব করেন প্রধানমন্ত্রী।

ধর্মের দিক থেকে এখানে চীনারা সংখ্যায় অধিক। আর তারা কনফিউসিয়স এবং তাউ ধর্মাবলম্বী। যারা মালাই, তারা সকলেই মুসলমান এবং শাফী মাজহাবের অনুসারী। এখানে পাকিস্তানীরাও রয়েছে। হিন্দুস্থান থেকে আগতরা হিন্দু ধর্মের অনুসারী। খৃষ্টানও অল্প সংখ্যক দেখতে পাওয়া যায়। ভাষা মালাই। ইংরেজী এবং চাইনিজ ভাষাও চালু আছে। তবে রাষ্ট্র ভাষা তামিল। এখানে একটি সমৃদ্ধশালী বন্দর রয়েছে যা পৃথিবীর ৪র্থ বন্দর হিসেবে খ্যাত। এখানকার বিমান বন্দর পৃথিবীর ব্যস্ততম বিমান বন্দর হিসেবে গণ্য করা হয়। প্রতি তিন মিনিট অন্তর অন্তর বিমান অবতরণ করে এবং উড্ডীন হয়। অধিকাংশ লোকের পেশা ব্যবসায় ও চাকুরী। বিশেষ করে এখানে ইলেকট্রনিক (বৈদ্যুতিক) সামগ্রী প্রস্তুত হয়। এটি একটি আশ্চর্যজনক ব্যবসায়। চীন দেশের মানুষ এখানে ব্যবসায় ছেয়ে আছে। আর এখানকার মানুষ খুব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন কাটাচ্ছে। কোন লোক বেকার বা কর্মহীন নেই। সিঙ্গাপুর অত্যন্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন শহর। পরিষ্কারের দিক থেকে ইউরোপকেও হার মানায়। ছোট শহর হওয়ার কারণে শতকরা ৭৫ ভাগ মানুষ Flats এ বসবাস করে। এগুলো এক একটা বিশতলা বিশিষ্ট আর সরকার এসব নির্মাণ করে থাকে এবং পরে জনগণের নিকট বিক্রি করে। সেখানে নিজস্ব বাড়ী তৈরী খুবই দুরূহ ব্যবহার। প্রথম তো জায়গার সমস্যা, তারপর ব্যয় অনেক বেশি। সুতরাং লোকেরা ফ্ল্যাটকেই অধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে।

বাড়ী-ঘরের পরিচ্ছন্নতার অবস্থা এরূপ যে, আপনি জুতো পরে ঘরে প্রবেশ করতে পারবেন

না। আপনাকে জুতো বাইরে খুলে নিতে হবে। খালি পায়ে ভিতরে প্রবেশ করতে হবে। ভিতরের জন্য সেন্ডেল ইত্যাদি রাখা থাকে তার পরে নিতে হয়। এতে ঘরের ভিতর অপরিচ্ছন্ন হয় না।

ধর্মীয় স্বাধীনতা ঃ

সিঙ্গাপুরে সম্পূর্ণরূপে ধর্মীয় স্বাধীনতা রয়েছে। অর্থাৎ কোন ধর্ম অথবা কোন ফিরকার একে অপরের বিরুদ্ধে জনসাধারণের মাঝে বিরূপ আলোচনার অনুমতি নেই। কেউ যদি এরূপ করে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়, তা হলে সাথে সাথে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। আর যদি কোন ভিন্ন দেশের মানুষ এমন করে তখন তাকে দেশ থেকে বের করে দেয়া হয়। সে জন্য সেখানে কোন মিশনারীকে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হয় না। খৃষ্টান বা মুসলমান বা অন্য কোন ধর্মের অনুসারীই হোক না কেন সিটিতে যেতে হলে যেখানে সরকারী অফিস রয়েছে, সেখানে কার নিয়ে যাবার জন্য বিশেষ পারমিট সংগ্রহ করতে হয়।

সিঙ্গাপুরে আহমদীয়তের ইতিহাস ঃ

১৯৩৫ সনে মোহতরম মাওলানা গোলাম হোসাইন আইয়াজ সাহেবের মাধ্যমে সিঙ্গাপুরের মিশন কার্যকর হয়। তিনি প্রথমে অত্যন্ত অসুবিধার মাঝে দিয়ে দিন যাপন করেন। সেখানে কাজ করার জন্য কেবল ছয় মাসের খরচ দেয়া হয়। তারপর তিনি নিজস্ব ব্যবসায় করে দিনাতিপাত করতে থাকেন এবং তবলীগের কাজ চালু রাখেন। খোদাতাআলা তাঁর চেষ্টায় বরকত দান করেন। এবং সৌভাগ্যবান আত্মাসমূহ ধীরে ধীরে আহমদীয়তের দিকে আসতে থাকেন। আমাদের একজন বন্ধু মোকার্‌রম হাজী জাফরদীন সাহেব। তিনি আহমদীয়ত গ্রহণের পর তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন হন। কিন্তু তিনি অত্যন্ত সাহসিকতা ও বাহাদুরীর সাথে সকল অবস্থার মোকাবেলা করেন।

মোকাররম আবদুল হামীদ সালেকীন সাহেব এবং মোকাররম হাসান আলাউদ্দীন সাহেব, মোকাররম মোহাম্মদ আলী সাহেব ইবনে হাজী মোহাম্মদ এবং মোস্তফা বিন হাজী সাহেবও তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

১৯৩৯ সনে আহমদীয়তের একজন ঘোর বিরুদ্ধবাদী আবদুল আলীম সিদ্দিকী মিরাটী সিঙ্গাপুরে যায়। এর পূর্বে আরো একবার তিনি সেখানে গিয়েছিলেন এবং আহমদীয়তের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করেছিলেন। এবার তিনি সুলতান মসজিদে একটি বক্তৃতা করেন সেখানে মোকাররম মাওলানা গোলাম হোসাইন আইয়াজ সাহেবও উপস্থিত ছিলেন। সেই ব্যক্তি বক্তৃতায় বলে যে, আহমদীদের কুরআন ভিন্ন। একথা শুনার পর মোকাররম মাওলানা গোলাম হোসাইন আইয়াজ সাহেব দাঁড়িয়ে উঠে বলেন, আমার নিকট কুরআন মজীদ মজুদ আছে। আমি চ্যালেঞ্জ করছি, একটি আয়াতও যদি দেখাতে পারেন যে, কুরআন ভিন্ন। তা হলে যা চাইবেন আমি সেরূপ শাস্তি নিতে প্রস্তুত আছি।

এরপর সেই মৌলভী জনগণের মাঝে মাওলানা সাহেবের বিরুদ্ধ উস্কানীমূলক বক্তৃতা ও উত্তেজনাকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করে তাঁর বিরুদ্ধে ওয়াজেবুল কতল ফতওয়া দেয়। সুতরাং লোকজন তাঁর ওপর আক্রমণ চালিয়ে মারধর করে তাঁকে জানালা দিয়ে (মসজিদের) বাইরে ফেলে দেয়। ফলে তিনি মারাত্মকভাবে আহত হন এবং অচেতন হয়ে পড়েন। তার সাথে মোকাররম মোহাম্মদ আলী সাহেবও ছিলেন। তিনি পুলিশকে খবর দেন। প্রায় আধা ঘন্টা পর পুলিশ তাঁকে এসে হাসপাতালে নিয়ে যায় এবং অনেক বিলম্বে তার চেতনা ফিরে আসে।

এ ঘটনার পর আরো একবার তাকে চলতি বাস থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়া হয়। এসব অবস্থার মাঝ দিয়েও তিনি তাঁর তবলীগী কার্যক্রম চালু রেখেছেন এবং বিরুদ্ধবাদীদের সঙ্গে সাহসিকতার সাথে মোকাবেলা করেছেন।

খোদাতাআলা তাঁকে তৌফীক দিয়েছেন। তিনি ১৯৪৭ সনে এক খন্ড জমি খরিদ করেন। এটা দু'টি প্রশস্ত সড়কের ধারে। এর পরিমাণ ১৯১৩৭ বর্গ ফুট। এর ওপর একটি কাঠের গৃহও ছিল। ১৯৮৩ সন পর্যন্ত মসজিদ হিসেবে এবং মিশন হাউসরূপে ব্যবহৃত হতে থাকে।

১৯৮৩ সনে যখন খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ) সিঙ্গাপুর আগমন করেন, তখন তিনি সেখানে মসজিদ এবং মিশন হাউসের ভিত্তি স্থাপন করেন। এমন খোদাতাআলার ফযলে তা সম্পন্ন হয়েছে। দ্বিতল বিশিষ্ট একটি দালান। এর ওপরের অংশে শানদার অতি সুন্দর মসজিদ রয়েছে এবং নীচের অংশে দপ্তর, লাইব্রেরী, লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র দপ্তর এবং হল রয়েছে।

মেহমানদের থাকার জন্যও জায়গা রয়েছে। মসজিদের বাইরে সাদা রংগের গম্বুজ রয়েছে। এ মসজিদের নাম মসজিদে ত্বা-হা। এখন খোদার ফযলে সেখানে প্রায় আড়াই শ' সদস্যের একটি মোখলেস জামাত কায়েম হয়েছে। মাওলানা গোলাম হোসাইন আইয়াজ সাহেব ১৯৫৯ সনের মধ্যরাতে ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন)। তাঁকে বড়মিউ শহরের লা বুওয়ানে দাফন করা হয়।

মোকাররম মাওলানা গোলাম হোসাইন আইয়াজ সাহেব ছাড়াও সিঙ্গাপুরে মোহাম্মদ সাঈদ আনসারী, মোকাররম মৌলভী ইমাম উদ্দীন সাহেব, মোকাররম মিঞা আবদুল হাই সাহেব, মোকাররম মাওলানা মোহাম্মদ সিদ্দীক সাহেব অমৃতসরী, মোকাররম মৌলবী উসমান সাহেব চীনী এবং মোকাররম কুরাইশী ফিরোজ মুহীউদ্দীন সাহেবকেও কাজ করার সৌভাগ্য দান করেন আল্লাহ্‌তাআলা।

সিঙ্গাপুরের এক আশ্চর্য বিষয় এই যে, সেখানে সরকারী কয়েকটি প্রতিষ্ঠান ছাড়া উপগ্রহের মাধ্যমে কোন প্রোগ্রাম শুনার অনুমতি নেই। সে জন্য সেখানে সাধারণত ডিস এন্টিনা দেখা যায় না। এমটিএ-এর প্রোগ্রাম শোনা ও দেখা থেকে তারা বঞ্চিত। তারা ইন্দোনেশিয়া থেকে হুযূর (রাহেঃ)-এর খুতবার ক্যাসেট এনে শুনে থাকেন।

সিঙ্গাপুরে সমুদ্রের ধারে অনেক অনেক সুন্দর ভ্রমণ কেন্দ্র এবং পার্ক রয়েছে। বিকাল বেলায় লোকেরা সমুদ্রের কিনারায় গিয়ে মুক্ত বাতাস গ্রহণ করে আনন্দ উপভোগ করে। মোহতারম প্রেসিডেন্ট এবং মুরব্বী শমসের সাহেবের সঙ্গে আমরাও সেখানে যাই।

সামনেই দেখা যায় ইন্দোনেশিয়া শহর। বলা যায়, খোদাতাআলার ফযলে কোন কোন দ্বীপাঞ্চলে সিঙ্গাপুর জামাতের প্রচেষ্টায় জামাত কায়েম হয়েছে। আর একটি দ্বীপের অধিকাংশ মানুষ আহমদীয়তের অধীনে এসে গেছে (আল হামদুলিল্লাহ্ আলা যালেক)।

Mount Fiber নামে পরিচিত একটি পর্বত রয়েছে। এর ওপর পর্যটন এবং ভ্রমণকারীদের জন্য খুব সুন্দর এবং দেখার মত সপিং সেন্টার আছে। ভ্রমণকারীদের জন্য বাস এবং প্রাইভেট ট্রান্সপোর্ট সারিবদ্ধ থাকে। এ পর্বত থেকে সিঙ্গাপুর এবং এর আশ-পাশের দ্বীপ দেখা যায়। আর পুরোপুরি সব দিকে সবুজ শ্যামল দৃশ্য চক্ষুকে শীতল করে দেয়। মোকাররম শমসের আলী সাহেব আমাদেরকে মালয়েশিয়ার সীমান্তেও নিয়ে যান। একটি পুলের দ্বারা সিঙ্গাপুরের সাথে এটি মিলানো হয়েছে। সেখানে দাঁড়িয়ে মালয়েশিয়ার দৃশ্য দেখেছি। অন্য দিকে মালয়েশিয়ার শহর। মোকাররম শমসের আলী সাহেব ইন্দোনেশিয়ার অধিবাসী হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে সিঙ্গাপুর আসার জন্য ভিসার প্রয়োজন হয়েছিল।

ভাষান্তর ঃ ডাঃ শেখ হেলাল উদ্দীন আহমদ
(মাসিক আনসারুল্লাহ্, ২০০৩ সনের জুন সংখ্যার সৌজন্যে)

আহমদীয়া মুসলিম জামাত-এর পক্ষ থেকে

সচেতন দেশবাসী ও শান্তিপ্রিয় নাগরিকদের কাছে বিনীত নিবেদন

গত কয়েক সপ্তাহ ধরে দেশের বিভিন্ন স্থানে একটি বিশেষ মহল আহমদীয়া মুসলিম জামাতভুক্ত নিরীহ মুসলমানদের (অনেকে যাদেরকে 'কাদিয়ানী' বলে থাকেন) বিরুদ্ধে আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে উল্লেখিত বিরোধী চক্র পুনরায় আমাদের নির্মিত ও পরিচালিত নাখালপাড়াস্থ আহমদীয়া মসজিদ জোরপূর্বক দখল করার প্রকাশ্য ঘোষণা দেয়ায় আমরা গভীরভাবে উদ্বিগ্ন ও উৎকণ্ঠিত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই চিহ্নিত চক্রটি আহমদীয়া জামাতের বিশ্বাস সম্পর্কে ভুল তথ্য পরিবেশন করে আহমদীয়া তরীকাভুক্ত লোকদের বিরুদ্ধে শান্তিপ্রিয় মুসলমানদেরকে উস্কানী দিয়ে থাকে। তাই জনগণের অবগতির জন্য আমরা অর্থাৎ আহমদী মুসলমানরা কী বিশ্বাস করি তা অতি সংক্ষেপে তুলে ধরছি।

আমরা মুসলমান, আমরা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ' কলেমা পাঠকারী, আমরা দুরূদ পাঠকারী, আমরা খাতামান নবীঈনে বিশ্বাসী, আমরা আহ্‌লে সুন্নত জামাতের ন্যায় সকল মৌলিক আকিদার উপর বিশ্বাসী। আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপপ্রচার-এর বিরুদ্ধে আমাদের নিবেদন শুনুন ঃ-

আহমদী মুসলমানদের ধর্ম বিশ্বাস ঃ আহমদীরা ইসলামের ৭৩ ফির্কার মাঝে একটি ফির্কা। আমাদের কলেমা **'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্'** অর্থাৎ আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নাই আর মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম হলেন আল্লাহ্‌র রসূল। আমরা কিবলামুখী হয়ে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ি, রমযানের রোযা রাখি, যাকাতের নেসাব পূর্ণ হলে যাকাত দেই এবং হজ্জের শর্ত পূর্ণ হলে হজ্জ করি। পবিত্র ইসলাম ধর্মের এবং পবিত্র কুরআনের সকল শিক্ষা ও অনুশাসনকে আমরা মনে প্রাণে ভালবাসি আর যথারীতি তা পালন করার চেষ্টা করি। খোলাফায়ে রাশেদীন ও মুজাদ্দেদগণের প্রতি আনুগত্য ও ভক্তি ভালবাসার দিক দিয়ে সুন্নী মুসলমানদের সাথে আমরা সম্পূর্ণ একমত। আমাদের অটল বিশ্বাস হলো, 'ইসলাম' আল্লাহ্ প্রেরিত পরিপূর্ণ ও সর্বশেষ ধর্ম এবং হযরত মুহাম্মদ (সঃ) খাতামান্নবীঈন। এরপর নতুন কোন ধর্ম বা শরীয়ত আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আসবে না। আর অন্যান্য ফের্কার মুসলমানরা মনে করেন, ইমাম মাহদী (আঃ) আসবেন কিন্তু তিনি এখনো আসেন নাই। আহমদীদের বিশ্বাস মতে, ভারতের কাদিয়ান নিবাসী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) হলেন সেই প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী। তিনি তাঁর নিজের ও জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস সম্বন্ধে বলেন- **"আমি সত্য বলছি এবং খোদাতা'লার কসম খেয়ে বলছি যে, আমি ও আমার জামা'ত মুসলমান। এ জামাত মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম ও কুরআন করীমের প্রতি ঠিক সেভাবেই ঈমান রাখে যেভাবে একজন সত্যিকার মুসলমানের ঈমান রাখা উচিত। ইসলাম থেকে কিঞ্চিৎ পরিমাণ পদস্খলনকে আমি ধবংসের কারণ বলে বিশ্বাস করি। আমার বিশ্বাস হলো, এক ব্যক্তি যত কল্যাণ ও বরকত লাভ করতে পারে, যতটা আল্লাহ্‌তা'লার নৈকট্য অর্জনে সক্ষম শুধুমাত্র মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সত্যিকার আনুগত্য, অনুসরণ ও পূর্ণ প্রেমের মাধ্যমেই সে তা লাভ করতে পারে, তা না হলে নয়। তাঁকে বাদ দিয়ে এখন পুণ্যের আর কোন পথ নেই"** (লেকচার লুধিয়ানা পুস্তক, পৃষ্ঠা- ১২)।

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) তাঁর জীবদ্দশায় নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পাদন করে ১৩২৬ হিঃ (ইংরেজী ১৯০৮) মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তাঁর ঐশী খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁর প্রতিষ্ঠিত খিলাফতের ক্রমধারায় বর্তমানে পঞ্চম খলীফা সারা বিশ্বে আহমদী মুসলমানদেরকে আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব দিয়ে চলেছেন।

বাংলাদেশে আহমদীয়ত ঃ সাংগঠনিকভাবে বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামাত প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯১২ সনে। ব্রাহ্মণবাড়ীয়া সদর এলাকার 'বড় মাওলানা' সাহেব হযরত মৌলভী সৈয়দ আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব (রহঃ) হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর জীবদ্দশায় তাঁর দাবীর বিষয়ে যাচাই-বাছাই করে ১৯১২ সনে কাদিয়ানে গিয়ে বয়াত করেন। তাঁর দেশে ফিরে আসার পর সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে ও যাচাই করে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া অঞ্চলের হাজার হাজার মানুষ হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর বয়াত করে আহমদীয়া জামাতভুক্ত হন। সেই থেকে শুরু হয় এর অগ্রযাত্রা। আজ বাংলাদেশের আহমদীয়া জামাত শতাধিক স্থানীয় শাখায় বিস্তৃত। এ জামাত নিবেদিত ধর্মপ্রাণ, নিরীহ ও সম্পূর্ণরূপে অরাজনৈতিক। বাংলাদেশের আহমদীরা এ মাটির সন্তান। একটু তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে আমরা আপামর জনসাধারণেরই ভাই-বন্ধু, আত্মীয়-স্বজন। স্বার্থান্বেষীদের উস্কানী ছাড়া আহমদীদের সাথে অন্যান্য মতাদর্শের লোকদের কোন ধরনের সামাজিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত নেই বরং আহমদীরা বিগত প্রায় ৯০ বছর ধরে এদেশে সৌহার্দ্যপূর্ণ সহাবস্থান করে আসছে। বাংলাদেশের আহমদীদের মাঝে ব্যবসায়ী থেকে আরম্ভ করে রিকশাচালক, দেশবরেণ্য শিক্ষাবিদ, উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্মকর্তা, গ্রামের সাধারণ কৃষক-শ্রমিকসহ সব ধরনের মানুষ রয়েছে যারা এ দেশের উন্নয়নে সমভাবে অবদান রেখে চলেছেন। হঠাৎ করে এ ধরনের অরাজক পরিস্থিতির উদ্ভব যে নিঃসন্দেহে উদ্দেশ্য প্রণোদিত ও একটি বিশেষ মহলের স্বার্থসিদ্ধির পরিকল্পনা মাত্র একথা যে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই বুঝতে পারবেন।

আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে আহমদীয়া জামাত ঃ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আহমদীয়া জামাত ইসলাম প্রচারে বিরাট অবদান রেখে

আহমদীয়া মুসলিম জামাত-এর পক্ষ থেকে

সচেতন দেশবাসী ও শান্তিপ্রিয় নাগরিকদের কাছে বিনীত নিবেদন

গত কয়েক সপ্তাহ ধরে দেশের বিভিন্ন স্থানে একটি বিশেষ মহল আহমদীয়া মুসলিম জামাতভুক্ত নিরীহ মুসলমানদের (অনেকে যাদেরকে 'কাদিয়ানী' বলে থাকেন) বিরুদ্ধে আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে উল্লেখিত বিরোধী চক্র পুনরায় আমাদের নির্মিত ও পরিচালিত নাখালপাড়াস্থ আহমদীয়া মসজিদ জোরপূর্বক দখল করার প্রকাশ্য ঘোষণা দেয়ায় আমরা গভীরভাবে উদ্বিগ্ন ও উৎকণ্ঠিত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই চিহ্নিত চক্রটি আহমদীয়া জামাতের বিশ্বাস সম্পর্কে ভুল তথ্য পরিবেশন করে আহমদীয়া তরীকাভুক্ত লোকদের বিরুদ্ধে শান্তিপ্রিয় মুসলমানদেরকে উস্কানী দিয়ে থাকে। তাই জনগণের অবগতির জন্য আমরা অর্থাৎ আহমদী মুসলমানরা কী বিশ্বাস করি তা অতি সংক্ষেপে তুলে ধরছি।

আমরা মুসলমান, আমরা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ' কলেমা পাঠকারী, আমরা দুরূদ পাঠকারী, আমরা খাতামান নবীঈনে বিশ্বাসী, আমরা আহ্‌লে সুন্নত জামাতের ন্যায় সকল মৌলিক আকিদার উপর বিশ্বাসী। আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপপ্রচার-এর বিরুদ্ধে আমাদের নিবেদন শুনুন ঃ-

আহমদী মুসলমানদের ধর্ম বিশ্বাস ঃ আহমদীরা ইসলামের ৭৩ ফির্কার মাঝে একটি ফির্কা। আমাদের কলেমা **'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্'** অর্থাৎ আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নাই আর মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম হলেন আল্লাহ্‌র রসূল। আমরা কিবলামুখী হয়ে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ি, রমযানের রোযা রাখি, যাকাতের নেসাব পূর্ণ হলে যাকাত দেই এবং হজ্জের শর্ত পূর্ণ হলে হজ্জ করি। পবিত্র ইসলাম ধর্মের এবং পবিত্র কুরআনের সকল শিক্ষা ও অনুশাসনকে আমরা মনে প্রাণে ভালবাসি আর যথারীতি তা পালন করার চেষ্টা করি। খোলাফায়ে রাশেদীন ও মুজাদ্দেদগণের প্রতি আনুগত্য ও ভক্তি ভালবাসার দিক দিয়ে সুন্নী মুসলমানদের সাথে আমরা সম্পূর্ণ একমত। আমাদের অটল বিশ্বাস হলো, 'ইসলাম' আল্লাহ্ প্রেরিত পরিপূর্ণ ও সর্বশেষ ধর্ম এবং হযরত মুহাম্মদ (সঃ) খাতামান্নবীঈন। এরপর নতুন কোন ধর্ম বা শরীয়ত আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আসবে না। আর অন্যান্য ফের্কার মুসলমানরা মনে করেন, ইমাম মাহদী (আঃ) আসবেন কিন্তু তিনি এখনো আসেন নাই। আহমদীদের বিশ্বাস মতে, ভারতের কাদিয়ান নিবাসী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) হলেন সেই প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী। তিনি তাঁর নিজের ও জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস সম্বন্ধে বলেন- **"আমি সত্য বলছি এবং খোদাতা'লার কসম খেয়ে বলছি যে, আমি ও আমার জামা'ত মুসলমান। এ জামাত মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম ও কুরআন করীমের প্রতি ঠিক সেভাবেই ঈমান রাখে যেভাবে একজন সত্যিকার মুসলমানের ঈমান রাখা উচিত। ইসলাম থেকে কিঞ্চিৎ পরিমাণ পদস্খলনকে আমি ধবংসের কারণ বলে বিশ্বাস করি। আমার বিশ্বাস হলো, এক ব্যক্তি যত কল্যাণ ও বরকত লাভ করতে পারে, যতটা আল্লাহ্‌তা'লার নৈকট্য অর্জনে সক্ষম শুধুমাত্র মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সত্যিকার আনুগত্য, অনুসরণ ও পূর্ণ প্রেমের মাধ্যমেই সে তা লাভ করতে পারে, তা না হলে নয়। তাঁকে বাদ দিয়ে এখন পুণ্যের আর কোন পথ নেই"** (লেকচার লুধিয়ানা পুস্তক, পৃষ্ঠা- ১২)।
হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) তাঁর জীবদ্দশায় নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পাদন করে ১৩২৬ হিঃ (ইংরেজী ১৯০৮) মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তাঁর ঐশী খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁর প্রতিষ্ঠিত খিলাফতের ক্রমধারায় বর্তমানে পঞ্চম খলীফা সারা বিশ্বে আহমদী মুসলমানদেরকে আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব দিয়ে চলেছেন।

বাংলাদেশে আহমদীয়ত ঃ সাংগঠনিকভাবে বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামাত প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯১২ সনে। ব্রাহ্মণবাড়ীয়া সদর এলাকার 'বড় মাওলানা' সাহেব হযরত মৌলভী সৈয়দ আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব (রহঃ) হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর জীবদ্দশায় তাঁর দাবীর বিষয়ে যাচাই-বাছাই করে ১৯১২ সনে কাদিয়ানে গিয়ে বয়াত করেন। তাঁর দেশে ফিরে আসার পর সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে ও যাচাই করে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া অঞ্চলের হাজার হাজার মানুষ হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর বয়াত করে আহমদীয়া জামাতভুক্ত হন। সেই থেকে শুরু হয় এর অগ্রযাত্রা। আজ বাংলাদেশের আহমদীয়া জামাত শতাধিক স্থানীয় শাখায় বিস্তৃত। এ জামাত নিবেদিত ধর্মপ্রাণ, নিরীহ ও সম্পূর্ণরূপে অরাজনৈতিক। বাংলাদেশের আহমদীরা এ মাটির সন্তান। একটু তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে আমরা আপামর জনসাধারণেরই ভাই-বন্ধু, আত্মীয়-স্বজন। স্বার্থান্বেষীদের উস্কানী ছাড়া আহমদীদের সাথে অন্যান্য মতাদর্শের লোকদের কোন ধরনের সামাজিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত নেই বরং আহমদীরা বিগত প্রায় ৯০ বছর ধরে এদেশে সৌহার্দ্যপূর্ণ সহাবস্থান করে আসছে। বাংলাদেশের আহমদীদের মাঝে ব্যবসায়ী থেকে আরম্ভ করে রিকশাচালক, দেশবরেণ্য শিক্ষাবিদ, উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্মকর্তা, গ্রামের সাধারণ কৃষক-শ্রমিকসহ সব ধরনের মানুষ রয়েছে যারা এ দেশের উন্নয়নে সমভাবে অবদান রেখে চলেছেন। হঠাৎ করে এ ধরনের অরাজক পরিস্থিতির উদ্ভব যে নিঃসন্দেহে উদ্দেশ্য প্রণোদিত ও একটি বিশেষ মহলের স্বার্থসিদ্ধির পরিকল্পনা মাত্র একথা যে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই বুঝতে পারবেন।

আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে আহমদীয়া জামাত ঃ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আহমদীয়া জামাত ইসলাম প্রচারে বিরাট অবদান রেখে

চলেছে। প্রায় একশ' বছর আগে ইসলাম প্রচারের ব্রত নিয়ে নিজেদের সীমিত সাধ্য ও সামর্থ্যে আহমদীরা যে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নেমেছিল আজ তাদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় ফল ধরেছে। বর্তমান বিশ্বে আহমদীরাই দেশে দেশে পবিত্র কুরআনের অনুবাদ করে মানুষের কাছে আল্লাহ্‌র কালামের মর্মার্থ পৌছে দিচ্ছে। আল্লাহ্‌তা'লার অপার অনুগ্রহে আহমদীয়া জামাত এ পর্যন্ত ৫৭টি ভাষায় কুরআনের পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ প্রকাশ করার সৌভাগ্য লাভ করেছে। আহমদীরাই উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া আর পূর্ব ও পশ্চিম আফ্রিকায় বৃহত্তম মসজিদগুলো স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে। দল ও মত নির্বিশেষে সকল মুসলমান এগুলো নিয়ে গর্বিত। কেবল তাই নয়, ছয়টি ভূ-উপগ্রহের মাধ্যমে এ জামাত 'মুসলিম টেলিভিশন আহমদীয়া ইন্টারন্যাশনাল' (MTA) নামক টিভি চ্যানেলে অহোরাত্র ইসলামের খাঁটি শিক্ষাকে বিশ্বব্যাপী প্রচার করে যাচ্ছে। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে মুসলিম অধ্যুষিত দেশগুলোর স্বার্থ রক্ষা ও আদায়ের ক্ষেত্রে স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব চৌধুরী স্যার মুহাম্মদ জাফরুল্লাহ খান এই জামাতেরই কৃতী সন্তান। পদার্থ বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রথম মুসলমান বিজ্ঞানী প্রফেসর ডঃ আব্দুস সালামও এই আহমদীয়া জামাতেরই সদস্য। এছাড়া পূর্ব আফ্রিকায় শিক্ষার প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে তানজানিয়ার প্রয়াতঃ কৃষ্ণাঙ্গ শিক্ষা মন্ত্রী জনাব আমরী উবাইদী ঐতিহাসিক ভূমিকা রেখেছেন। তিনিও এই আহমদীয়া জামাতেরই সদস্য। বর্তমানে পশ্চিম আফ্রিকার উন্নয়নশীল দেশগুলোতে তৃতীয় বিশ্বের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য সেখানকার দেশগুলোর আহমদীয়া মতাবলম্বী পাঁচ ছয় জন মন্ত্রী ও বহু সাংসদ দিন রাত কাজ করে যাচ্ছেন।

পশ্চিম ও পূর্ব আফ্রিকার অবহেলিত জনগোষ্ঠীকে শিক্ষার আলো দিতে ও উন্নত চিকিৎসা সুবিধা প্রদান করতে আহমদীয়া জামাত ১৯২০ সন থেকে এ পর্যন্ত সেখানে প্রায় ৩০০টি স্কুল-কলেজ ও ৩৮টি পূর্ণাঙ্গ হাসপাতাল নিজ খরচে পরিচালনা করে যাচ্ছে।

সম্প্রতি আহমদীয়া মুসলিম জামাত কর্তৃক নির্মিত ১০ হাজার মুসল্লী ধারণক্ষম পশ্চিম ইউরোপের বৃহত্তম মসজিদ (লন্ডন)

এছাড়াও মানবতার সেবায় বিশেষ করে মুসলমানদের বিপদে আপদে আহমদীরা সাহায্যের হাত প্রসারিত করে চলেছে। বিগত ৯০ দশকের মাঝামাঝি ZAIRE-এর গৃহ-যুদ্ধের সময়ে কলেরার মহামারীতে আক্রান্ত লক্ষ লক্ষ মানুষকে আহমদীয়া জামাত চিকিৎসা সেবা প্রদান করেছে।

একই সময়ে ইউরোপ মহাদেশে একমাত্র মুসলিম অধ্যুষিত দেশ বসনিয়ার নির্যাতিত মুসলমানদেরকে সম্ভাব্য সব ধরনের মানবিক সাহায্য সহযোগিতার ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক ভূমিকা রাখার সৌভাগ্য আহমদীয়া জামাত লাভ করেছে। সারা পৃথিবীতে একক ঐশী খিলাফতের অধীনে বর্তমানে ১৭৭ টি দেশে প্রায় ১৬ কোটি আহমদী মুসলমান খাঁটি ইসলামের সেবায় সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করে যাচ্ছে। এ জামাতের তবলীগে হাজার হাজার পাশ্চাত্যবাসী ইসলাম গ্রহণ করেছে ও করছে।

প্রিয় দেশবাসী, বর্তমানে মুসলমানরা আন্তজার্তিক অঙ্গনে বড় ধরনের বিপর্যয়ের সম্মুখীন। বাইরের শত্রুর আক্রমণে আজ যখন মুসলমানরা আহত ও ক্ষত-বিক্ষত তখন নিজেদের মাঝে অন্তর্দ্বন্দ্ব ও কলহ-বিবাদ সৃষ্টি করে আমরা জগতের সামনে নিজেদেরকেই আরও হেয় করে তুলছি। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত ওআইসি শীর্ষ সম্মেলনে এই একই কথা প্রতিধ্বনিত হয়েছে। মালয়েশিয়ার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মোহাম্মদ আলেমগণের উদ্দেশ্যে কলহ-বিবাদ ত্যাগ করে শান্তির পথে এক হওয়ার আহ্‌বান জানিয়েছেন। বিদায় হজ্জের দিন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)ও আমাদেরকে বলে গেছেন- **"এক মুসলমানের জান-মাল ও সম্পদ অন্য মুসলমানের জন্য হারাম"**।

আমরা দৃঢ় বিশ্বাস রাখি, বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণ ধর্মভীরু কিন্তু ধর্মান্ধ নয়। তারা ধর্মের নামে নৈরাজ্য ও অশান্তি সৃষ্টি পসন্দ করে না। সকল শান্তিপ্রিয় দেশবাসী ও সচেতন মুসলমানদের কাছে আবেদন, দয়া করে এক শ্রেণীর স্বার্থান্বেষী উগ্র মহলের উস্কানীতে বিভ্রান্ত না হয়ে সকল ধর্মীয় মতবিরোধ শান্তিপূর্ণ ও সৌহার্দ্যপূর্ণ উপায়ে দূর করতে সচেষ্ট হবেন। এক্ষেত্রে এমন কোন কাজ করা কারও পক্ষে উচিত হবে না যা পবিত্র ইসলামের শিক্ষা বিরোধী এবং ইসলামের দুর্নাম ও দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট করার কারণ হয়। আমরা অত্যন্ত বিনীতভাবে দেশবাসীর বিবেকের কাছে একটি প্রশ্ন রাখতে চাই আর তা হলো, ধর্মীয় মত পার্থক্যের কারণে মানুষকে দিনের পর দিন অবরুদ্ধ করে রাখা, পবিত্র জুমুআর নামায শেষে নিরীহ ইমামকে হত্যা করা, আর অন্য ফির্কার মসজিদকে গায়ের জোরে দখল করে নেয়ার চেষ্টা চালানো কি ইসলামসম্মত ? যুগে যুগে নবী-রসূল বা তাঁদের অনুসারীরা এ ধরনের গর্হিত অত্যাচার-অনাচার করেছিলেন নাকি নবী-রসূলদের বিরুদ্ধবাদীরা করেছিল? ইসলাম রক্ষা করার নামে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীরা কি মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ)-এর আদর্শ বাস্তবায়ন করছে নাকি তাঁর বিরুদ্ধবাদীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করছে-তা আমাদের সকলের ভেবে দেখার সময় এসেছে।

মহান আল্লাহ্ আমাদের সবাইকে সত্য ও শান্তির পথে পরিচালিত করুন, ওয়াস্‌সালাম।

প্রচার সম্পাদক
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ
৪ নং বকশীবাজার রোড
ঢাকা-১২১১।

এসো কুরআন শিখি

(১১তম কিস্তি)

আয়াত নং ৭৭ ঃ

শব্দার্থ ঃ **ওয়া ইযা** - এবং যখন, **লাক্বুল্লাযীনা আমানূ** - তারা তাদের সাথে দেখা করে যারা ঈমান এনেছে, **ক্বালূ** - তারা বলে, **আমান্না** - আমরা ঈমান এনেছি, **ওয়া ইযা খলা** -এবং যখন তারা নিভৃতে মিলিত হয়, **বা'যুহুম ইলা বা'যিন** - পরস্পর নিজেদের মাঝে, **ক্বালূ** - তারা বলে, **আতু হাদ্দিসূনাহুম** - তোমরা কি তাদেরকে বলে দাও, **বিমা ফাতাহাল্লাহু 'আলায়কুম** - আল্লাহ্ তোমাদের নিকট যা প্রকাশ করেছেন, **লি ইউ হা-জ্জুকুম বিহী** - যাতে তারা এ দিয়ে তোমাদের বিরুদ্ধে বিতর্কে লিপ্ত হয়, **'ইনদা রব্বিকুম** - তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের কাছে, **আফালা তা'ক্বিলূন** - তোমরা কি বিবেক-বুদ্ধি খাটাবে না?

অনুবাদ ঃ এবং যখন তারা তাদের সাথে দেখা করে যারা ঈমান এনেছে, তখন বলে, 'আমরা ঈমান এনেছি।' এবং যখন তারা পরস্পর নিজেদের মাঝে নিভৃতে মিলিত হয় তখন তারা বলে,'আল্লাহ্ তোমাদের নিকট যা প্রকাশ করেছেন তোমরা কি তা তাদেরকে বলে দাও, যাতে তারা এ দিয়ে তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের কাছে তোমাদের বিরুদ্ধে বিতর্কে লিপ্ত হয়? তোমরা কি বিবেক-বুদ্ধি খাটাবে না?

আয়াত নং ৭৮ ঃ

শব্দার্থ ঃ **আওয়ালা ইয়া'লামূনা** - তারা কি জানে না, **আন্নাল্লাহা ইয়া'লামু** - নিশ্চয় আল্লাহ্ জানেন, **মা ইউসিরূরূনা** - তারা যা গোপন করে, **ওয়া মা ইউলিনূন** - এবং তারা যা প্রকাশ করে।

অনুবাদ ঃ তারা কি জানে না, তারা যা গোপন করে ও যা প্রকাশ করে নিশ্চয় আল্লাহ্ তা জানেন?

আয়াত নং ৭৯ ঃ

শব্দার্থ ঃ **ওয়া মিনহুম উম্মিয়্যূনা** - তাদের মাঝে এমন অজ্ঞও আছে, **লা ইয়া'লামূনাল কিতাবা** - যারা কিতাবের জ্ঞান রাখে না, **ইল্লা আমা-নিয়্যা** - মিথ্যা কল্প-কাহিনী ছাড়া, **ওয়া ইন্নাহুম ইল্লাইয়াযুন্নূন** - আর তারা কেবল অনুমান করে।

অনুবাদ ঃ এবং তাদের মাঝে এমন অজ্ঞও আছে যারা মিথ্যা কল্প-কাহিনী ছাড়া কিতাবের কোন জ্ঞান রাখে না আর তারা কেবল অনুমান করে।

আয়াত নং ৮০ ঃ

শব্দার্থ ঃ **ফাওয়াইলুন** - অতএব দুর্ভোগ, **লিল্লাযীনা** - তাদের জন্যে যারা, **ইয়াকুতবূনাল কিতাব** - যারা কিতাব লেখে, **বিআইদীহিম** - নিজেদের হাতে, **সুম্মা** - এরপর, **ইয়াক্বূলূনা** - তারা বলে, **হাযা মিন 'ইন্দিল্লাহ্** - এটা (কিতাব) আল্লাহ্র পক্ষ থেকে, **লি ইয়াশ্-তারূবিহী** - যেন তারা একে বিক্রী করে, **সামানান ক্বলীলান** - তুচ্ছ মূল্যে, **ফাওয়াইলুল্লাহুম** - সুতরাং তাদের জন্যে দুর্ভোগ, **মিম্মা কাতাবাত** - যা লিখেছে এর দরুন, **আইদীহিম** - তাদের হাতে, **ওয়া ওয়াইলুল্লাহুম** - এবং দুর্ভোগ তাদের জন্যে, **মিম্মা ইয়াকসিবূন** - যা তারা উপার্জন করে এর দরুন।

অনুবাদ ঃ অতএব দুর্ভোগ তাদের জন্যে যারা নিজেদের হাতে কিতাব লেখে এরপর এর বিনিময়ে তুচ্ছমূল্য পাওয়ার জন্যে তারা বলে, 'এটাও আল্লাহ্র পক্ষ থেকে'। সুতরাং তাদের হাত যা লিখেছে এর দরুন তাদের জন্য দুর্ভোগ এবং যা তারা উপার্জন করে এর দরুনও তাদের জন্য দুর্ভোগ।

আয়াত নং ৮১ ঃ

শব্দার্থ ঃ **ওয়া ক্বালূ** - এবং তারা বলে, **লান্ তামাস্সানান্নারু** - আগুন আমাদেরকে কখনও স্পর্শ করবে না, **ইল্লা আয়্যামাম্মাদূ'দাহ্** - মাত্র কয়েক দিন ছাড়া, **কুল** - তুমি বল, **আতাত্তাখাযতুম** - তোমরা কি নিয়ে রেখেছ? **'ইনদাল্লাহি** - আল্লাহ্র কাছে, **আহদান** - কোন অঙ্গীকার, **ফালাইউখলিফাল্লাহু** - তাহলে আল্লাহ্ কখনও ভঙ্গ করবেন না, **আহদাহূ** - তাঁর অঙ্গীকার, **আম তাক্বূলূনা** - অথবা তোমরা বলছো বা আরোপ করছ, **'আলাল্লাহ্** - আল্লাহ্র বিরুদ্ধে, **মালা তালামূন** - যা তোমরা জান না।

অনুবাদ ঃ এবং তারা বলে, 'মাত্র কয়েকদিন ছাড়া আগুন আমাদেরকে কখনো স্পর্শ করবে না।' তুমি বল, 'তোমরা কি আল্লাহ্র কাছ থেকে কোন অঙ্গীকার নিয়ে রেখেছো?' তাহলে আল্লাহ্ কখনও তাঁর অঙ্গীকার ভঙ্গ করবেন না। নাকি তোমরা আল্লাহ্র বিরুদ্ধে এমন কথা বলছো যা তোমরা জান না?

আয়াত নং ৮২ ঃ

শব্দার্থ ঃ **বালা** - হ্যাঁ, অবশ্যই, **মান কাসাবা সাইয়্যেতান** - যে-ই পাপ কামাই বা অর্জন করে, **ওয়া তাহা-ত্বতবিহী** - আর তাকে ঘিরে ফেলে, **খত্বীযাতুহূ** - এর দোষ-ক্রটি, **ফা উলা-ইকা** - এরাই হলো, **আসহা-বুন্নার** - আগুনের অধিবাসী, **হুম ফীহা খালিদূন** -এতে তারা দীর্ঘকাল থাকবে।

অনুবাদ ঃ হ্যাঁ, অবশ্যই যে-ই পাপ কামাই করে আর এর দোষ-ক্রটি তাকে ঘিরে ফেলে এরাই হলো আগুনের অধিবাসী এতে তারা দীর্ঘকাল থাকবে।

আয়াত নং ৮৩ ঃ

শব্দার্থ ঃ **ওয়াল্লাযীনা আমানূ** - আর যারা ঈমান এনেছে, **ওয়া আমিলুস্ স-লিহা-তি** - ও সৎ কাজ করেছে, **উলা-ইকা আসহা-বুল জান্নাহ্** - এরাই জান্নাতের অধিকারী, **হুমফীহা খালিদূন** - সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।

অনুবাদ ঃ আর যারা ঈমান এনেছে ও সৎ কাজ করেছে এরাই জান্নাতের অধিবাসী, সেখানে তারা চিরকাল বাস করবে। *৯ রুকূ*

আয়াত নং ৮৪ ঃ

শব্দার্থ ঃ **ওয়া ইয** - এবং যখন, **আখাযনা** - আমরা নিয়েছিলাম, **মীসা-ক্ব**-দৃঢ় অঙ্গীকার, **বানী ইসরা-ঈলা** - বনী ইসরাঈল, **লা তা'বুদূনা ইল্লাল্লাহূ** -আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করবে না, **ওয়া বিল ওয়ালিদায়নি** - এবং পিতা-মাতার সাথে, **ইহ্সানান** - সদয় ব্যবহার করবে, **ওয়া যিল কুরবা** - এবং আত্মীয়-স্বজন, **ওয়াল ইয়াতা-মা**-ও এতীম, **ওয়াল মাসা-কীন** -এবং গরীব, **ওয়া কুলূ লিন্নাসী** - আর লোকদের সাথে বলবে, **হুসনান** - সুন্দর ও উত্তম কথা, **ওয়া আক্বিমুস্সলাহ্** - এবং নামায কায়েম করবে, **ওয়া তুয্যাকা-হ্** - এবং যাকাত দিবে, **সুম্মা** - তা সত্ত্বেও, **তাওয়াল্লায়তুম** - তোমরা উপেক্ষা করলে, **ইল্লা ক্বালীলাম্মিনকুম** - তোমাদের অল্প লোক ছাড়া, **ওয়া আনতুম মু'রিযূন** - তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিলে।

অনুবাদ ঃ এবং (স্মরণ কর) যখন আমরা বনী ইসরাঈলের (কাছ থেকে) দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়েছিলাম ঃ 'তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করবে না, এবং পিতা-মাতার সাথে সদয় ব্যবহার করবে, আত্মীয়-স্বজন ও এতীম এবং গরীবদের সাথেও, আর তোমরা লোকদেরকে সাথে সুন্দর ও উত্তম কথা বলবে এবং নামায কায়েম করবে ও যাকাত দিবে, তা সত্ত্বেও তোমরা অল্প সংখ্যক লোক ছাড়া সকলেই উপেক্ষা করে মুখ ফিরিয়ে নিলে। (চলবে)

সংকলন - **মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান**

প্রকৃত মুসলমান কে বা কারা?

(২য় কিস্তি)

দীর্ঘ সময় ধরে আমরা বিভিন্ন ধরনের ফতওয়া শুনালাম। এখন ভয় হচ্ছে, তা হলে কি আমরা সবাই কাফির? যেভাবে ফতওয়ার ছড়াছড়ি এতে তো বুঝা যাচ্ছে বর্তমানে আর কেউ প্রকৃত মুসলমান নেই, (নাউযুবিল্লাহ্)। দেখা যায় সকল সম্প্রদায়ই কাফির বা অমুসলমান হয়ে আছে। সবাই যদি অমুসলমান হয়ে থাকে তাহলে বর্তমান যে পাঁচ বেলার আযান হচ্ছে তা কি লোক দেখানো? যারা কলেমা, নামায, রোযা, যাকাত, হজ্জ সব মেনে চলছে তা-ও কি মিথ্যা? আমরা লক্ষ্য করছি- বর্তমান সমাজে যারা প্রকৃতভাবে আল্লাহ্ ও রসূলের অনুসারী হিসেবে দাবী করে তারাও নাকি অমুসলমান। যতই ফতওয়ার প্রচলন থাকুক না কেন তারপরও অবশ্যই দেশে প্রকৃত ইসলামের অনুসারী আছে। কারণ ইসলামই আল্লাহ্র একমাত্র মনোনীত ধর্ম (আলে ইমরান ঃ ২০)। এখন আমাদেরকে বের করতে হবে কোন্ দল প্রকৃত মুসলমান। কারা পবিত্র কুরআন ও হাদীসকে সঠিকভাবে মান্য করে, কাদের মাঝে রসূল করীম (সঃ)-এর আদর্শ আজও বলবৎ রয়েছে। কোন দলে নক্ষত্ররাজির ন্যায় উজ্জ্বল ঝকমক সাহাবীদের আদর্শ রয়েছে। আজ যদি আমরা রসূল করীম (সঃ) যা বলে গেছেন তা কোন দলের মাঝে খুঁজে পাই তা হলে অবশ্যই প্রকৃত মুসলমান কে বা কারা পেয়ে যাব। দেখুন আজ ধর্মে কত মতভেদ অথচ আল্লাহ্তাআলা বলেছেন, 'ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং মতভেদ করো না' (আশ্ শূরা ঃ ১৬)। আল্লাহ্তাআলা আরো বলছেন, 'যে বিষয়ে তোমাদের জ্ঞান নেই সে বিষয়ে অনুমানের মাধ্যমে পরিচালিত হয়ো না' (বনী ইসরাঈল ঃ ৩৭)।

একটু চিন্তা করে দেখুন, বর্তমানে যারা অন্য দলকে কাফির আখ্যা দিচ্ছে সঠিকভাবে জেনে-বুঝে তাদেরকে কি আখ্যা দিচ্ছে না অনুমানের ভিত্তিতে আখ্যা দিচ্ছে? খোদা তো নিষেধ করে দিয়েছেন, 'যে বিষয়ে জ্ঞান নেই সে বিষয়ে অনুমানের মাধ্যমে কোন কাজ করো না।' তা হলে অযথা কেন খোদার কথাকে অমান্য করছি। আসলে তো যারা খোদার কথাকে মান্য করে না তারাই অমুসলমান। এখন আমাদেরকে বের করতে হবে আজ পর্যন্ত কারা কোন দলকে কাফির আখ্যা দেয় নি। এমন কোন দলকে যদি পেয়ে যাই তাহলে তো প্রকৃত মুসলমান দলকে বের করা কষ্টকর নয়। রসূল করীম (সঃ)-এর এ হাদীস থেকেই আমরা প্রকৃত মুসলমান দল বা মুক্তিপ্রাপ্ত দল কোন্টি তা পেয়ে যাব, ইনশাআল্লাহ্। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর হতে বর্ণিত হয়েছে, 'হযরত রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'নিশ্চয় আমার উম্মতের উপরও সেই সকল অবস্থা আসিবে যেইরূপ বনী ইসরাঈলের উপর আসিয়াছিল। উভয়ের এক জুতার সাথে অপর জুতার ন্যায় সাদৃশ্য থাকিবে, এমন কি তাহাদের মধ্য হইতে যদি কেহ প্রকাশ্যে নিজ মাতার নিকট গমন করে থাকে তদ্রূপ আমার উম্মতের মধ্যে এমন ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করবে যে সেরূপই করিবে। বনী ইসরাঈলতো ৭২ ফিরকায় (দলে) বিভক্ত হইয়াছিল, আমার উম্মত ৭৩ ফিরকায় (দলে) বিভক্ত হইবে। তাহাদের প্রত্যেকেই জাহান্নামে যাইবে কেবল মাত্র এক ফিরকাহ্ (দল) ব্যতীত'। তাঁরা (সাহাবীগণও বলিলেন, 'হে আল্লাহ্র রসূল! সেই ফিরকাহ্ কোন্টি?' তিনি (সঃ) বলিলেন, 'আমি এবং আমার সাহাবাগণ যে পথে আছে সেই পথে যে ফিরকাহ (দল) থাকিবে' (তিরমিযী ঃ কিতাবুল ঈমান)। হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর মুখ নিঃসৃত বাণী সূর্য হতেও উজ্জ্বল এবং সত্য। কোন মু'মিন তাঁর বাণীকে অবহেলা করে এড়িয়ে যেতে পারে না। বলা বাহুল্য, হুযূর আকদস ((সঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী এ উম্মতের মাঝে ৭৩ ফিরকাহ্ হয়ে গেছে। আর প্রত্যেকেই নিজ নিজ ফিরকাকে সত্য ও মুক্তিপ্রাপ্ত ফিরকাহ্ বলে বিশ্বাস করে এবং গর্ব ও আনন্দবোধ করে। যেমন- আল্লাহ্তাআলা বলেছেন- 'কিন্তু তারা নিজেদের ধর্মকে খন্ড-বিখন্ড করে নিয়েছে। প্রত্যেক দলই তাদের স্ব স্ব মতবাদ নিয়ে সন্তুষ্ট তাই ওদের কিছুকালের জন্য বিভ্রান্তিতে থাকতে দাও' (২৩ঃ ৫৪-৫৫)। বর্তমান যুগে যে এই অবস্থা হবে তা খোদাতাআলা পূর্বেই অবহিত করে দিয়েছেন। আজ কি প্রত্যেক ধর্মীয় ফিরকাহ্ নিজ নিজ দলকে নিয়ে সন্তুষ্ট নয়? সবাই সত্য-তাহলে সেই এক দল যা রসূল করীম (সঃ) বলে গেছেন, যারা হবে মুক্তি-প্রাপ্ত তারা কারা? প্রকৃতপক্ষে কেবলমাত্র একটি ফিরকাই সত্য ও মুক্তিপ্রাপ্ত হবে। অপর পক্ষে এ বিষয়ের মীমাংসা স্বয়ং নবী করীম (সঃ) করে দিয়েছেন এবং এ সত্য ও মুক্তিপ্রাপ্ত ফিরকাকে চিনবার জন্য তিনি তাঁর উম্মতকে মাপ কাঠিও হাতে তুলে দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেছেন, 'আমি এবং আমার সাহাবাগণ যে পথে আছে সেই পথে যে ফিরকাহ্ (দল) বা থাকবে'। এখন আমাদেরকে দেখতে হবে রসূল করীম (সঃ)-এর ইন্তেকালের পর সাহাবারা কোন্ পথ অবলম্বন করছেন। আমরা জানি সাহাবাদের পথ ও কার্যাবলীর দৃষ্টান্ত এই ছিল যে, যত দিন নবী করীম (সঃ) সাহাবাদের মাঝে ছিলেন ততদিন তারা তাঁকে সর্বান্তকরণে পুঙ্খাণুপুঙ্খরূপে অনুসরণ করে গেছেন এবং হুযূর আকদস (সঃ)-এর ইন্তেকালের পরক্ষণেই তাদের মাঝে নিম্নবর্ণিত বৈশিষ্ট্য দেখা দিয়েছিল। যেমন ঃ

১. তাদের মাঝে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। যার মাধ্যমে সাহাবাগণ একতা শৃঙ্খলা ও পারস্পরিক ভিত্তিতে এক শক্তিশালী জাতিতে পরিণত হয়েছিলেন এবং খলীফার নেতৃত্বাধীনে তাঁরা পারশ্য, সিরিয়া, ইরাক ও মিশর প্রভৃতি দেশ জয় করেন এবং ইসলামী পতাকার ছায়াতলে এনে এক স্বর্গ রাজ্যে পরিণত করেছিলেন।

২. তাদের মাঝে একটি কেন্দ্র ছিল, যার মাধ্যমে সমস্ত পৃথিবীতে ইসলামের প্রচার কাজ চলতো।

৩. তাদের মাঝে 'বায়তুল মাল' ছিল।

৪. খলীফাকে পরামর্শ দেয়ার জন্য 'মজলিসে শূরা' (পরামর্শ সভা) ছিল।

৫. তাদের মাঝে পরম ভ্রাতৃত্ববোধ ছিল এবং একে অপরের জন্য প্রিয় হতে প্রিয়তর বস্তু এমনকি কারও জন্য জীবন পর্যন্ত কুরবান করত।

৬. তারা সর্বদা ইসলাম প্রচারে নিয়োজিত থাকতেন।

এখন চিন্তা করতে হবে উপরে বর্ণিত বৈশিষ্ট্যগুলো কোন ইসলামী দলে আজও সঠিকভাবে আছে কিনা? সবগুলো বৈশিষ্ট্য যদি কোন দলে পাওয়া যায় তাহলে আমরা ধরে নিব যে, এটিই সেই মুক্তিপ্রাপ্ত জামাত। রসূল করীম (সঃ) বলেন, 'মুসলমান সে-ই যার মুখ এবং হাত থেকে অন্যান্য মুসলমান নিরাপদ' (মুসলিম, কিতাবুল ঈমান)। এখন আমাদেরকে প্রকৃত মুসলমান বের করতে হলে এটিও লক্ষ্য করতে হবে কোন ফিরকাহ্ বা দল অন্য কোন দলকে হাত বা মুখ দ্বারা গালি-গালাজ করে না, অর্থাৎ প্রকৃত মুসলমান তো তারাই যাদের হাত ও মুখ হতে অন্যান্যরা নিরাপদ (মুসলিম)। আজ আমরা দেখি ইসলামে সব দলেই এক অপরকে কাফির বলে রেখেছে। তারা হাতে আক্রান্ত না করতে পারলেও মুখ দ্বারা ঠিকই গালি-গালাজ করে। রসূল করীম (সঃ) যেমন বলেছেন, একটি দল অবশ্যই জান্নাতী হবে, যারা তাঁর ও সাহাবীদের মতও পথ অবলম্বন করে চলছে। তাই আজ যদি কোন ফিরকার মাঝে উপরে বর্ণিত বৈশিষ্ট্যগুলো ও হাত-মুখ থেকে অন্যরা নিরাপদ থেকে থাকে তারাই মনে হয় প্রকৃত মুসলমান বলে দাবীর অধিকার রাখে।

আজ উগ্রপন্থী ধর্ম ব্যবসায়ীরা লোকদেরকে অন্ধ করে রেখেছে। তারা লোকদের প্রতি নানাভাবে মিথ্যা অভিযোগ করে নিজ অর্থ লাভের জন্য শান্তিপ্রিয় মানুষকে কষ্টের সম্মুখে নিপতিত করছে। পৃথিবীতে আজ একটিই জামাত রয়েছে যার অনুসারীরা অপর কোন মুসলমান ভাইকে কোনরূপ কষ্ট দিতে প্রস্তুত নয় তারা হলো আহমদীয়া মুসলিম জামাত এর অনুসারী। চলুন দেখা যাক আহমদীয়া মুসলিম জামাতের অনুসারীরা কোন্ ধরনের ধর্মীয়-বিশ্বাসে বিশ্বাসী। অনেকে তো অনেক কথাই বলে যে, আহমদীরা নাকি খোদা-রসূল কিছুই মানে না, তারা নামায পড়ে না, রোযা রাখে না, হজ্জ পালন করে না, তাদের কালেমাও নাকি পৃথক। এ ধরনের কথাতো আমরা প্রায় আলেম-উলামাদের কাছ থেকে শুনতে পাই। আমরা লক্ষ্য করে দেখেছি বিভিন্ন স্থানের দেয়ালে দেয়ালে লিখে রাখা হয়েছে কাদিয়ানীরা কাফির, তাদের অনুসারীরাও কাফির- আল্ কুরআন, আল্ হাদীস। আসলেই কি কাদিয়ানীরা যে কাফির এ কথা কুরআন হাদীসের কোন স্থানে আছে? এ প্রশ্ন একজন করার ফলে উত্তরে আমাকে বলেছিলেন, হুযূর বলেছেন আছে। চিন্তা করে দেখুন কত বড় মিথ্যা কথা এবং কি মিথ্যা শিক্ষাই না দিচ্ছেন আজকের হুযূরেরা। কুরআন হাদীসের কোন স্থানে কাদিয়ানীরা কাফির এমন কথা কেউ বের করতে পারবে না। পথ-ভোলা মানুষ তাদের ঈমান বিক্রি করে দিয়েছে উগ্র মোল্লাদের কাছে। মোল্লারা যা খুশি তা বলছে আর জনগণ সেসব কথাকে সত্য বলে মেনেও নিচ্ছে। সত্যিকার মুসলমানকে অমুসলমান আখ্যায়িত করার নামই কি ইসলাম? আজ না দেখে না যাচাই করে কাফির বলা হচ্ছে। বড় ওয়াজ মাহফিলে বক্তব্য রাখছে তাতেও লোকদের প্রকৃত ইসলামের কথা তুলে না ধরে তুলে ধরছে রাজনৈতিক কথা। কীভাবে দেশ থেকে সৎ মানুষকে তাড়ানো যায় সেই কৌশল করা হয়। রাষ্ট্রীয়ভাবে মুসলমানকে অমুসলমান করার জন্য দাবী করা হচ্ছে। মুসলমানকে যদি অমুসলমান আখ্যা দেয়ার কাজ রাষ্ট্রের হয়ে থাকে তাহলে তো কোন অমুসলমানকেও তারা মুসলমানের সার্টিফিকেট দিতে পারবে। আজ কথায় কথায় তারা আহমদীদেরকে কাফির ঘোষণা করার জন্য সরকারের নিকট দাবী জানাচ্ছেন। এ সব বাজে চিন্তা-ভাবনা কি কোন আলেম সমাজের কাজ হতে পারে? আসুন এখন দেখি আহমদীদের ধর্ম বিশ্বাসে কোন অনৈসলামিক কথা-বার্তা আছে কিনা? (চলবে)

- মাহমুদ আহমদ সুমন

কবিতা

শাহ্ আলমের শাহাদত

কালে কপোল তলে আবার ফুটিল এক রক্ত জবা,
শহীদী রক্তের প্রতীক এতো হায়ানার হিংস্র থাবা।
ধর্মের নামে রক্ত স্রোতে পিশাচের অবগাহন,
আহমদীয়তের ইতিহাসে হলো নতুন সংযোজন।
যশোরের আলম মরে নাই জেনো খড়গ কৃপাণ বলে,
শহীদী রক্তের লহর মিশেছে কালের চক্র ভালে।
যে স্রোতের বানে বইছে খোদার রহমত আবহমান,
আলমের রক্ত মিশিয়া তাতে বেড়েছে দেশের মান।
যশোর জেলার পলল ভূমি সিক্ত যে হলো তাতে,
উর্বরতা বাড়ালো উহা যুগান্তরের ভালে।
খোদার প্রেমের রক্ত নিশান উদিল পলল ভূমে,
উষর মরুর রক্ত লিখন শোভিল জলজ ধামে।
জেনে রেখ সবাই একাকার হলো মরুপলি এক সাথে,
রূহানী ধামে দু-আব স্রোতের অভিনব সঙ্গমে।
রঘুনাথপুর বাগের সুশীল জনতা শুনে রেখো কান খুলে,
শহীদ আলমের সমাধি ভূমে জনতা আসবে সদলবলে।
শুন এবে সব শহীদ আলমের স্বজনগণে,
তোমাদের আলম আছে বেঁচে জেনো খোদার আলিঙ্গনে
অমর পুরের কালজয়ী সে শোভিছে ইলাহী তাজে
কালের চক্রে ভেদিয়া উদিল নূরে ইলাহীর সাজে।
পুনঃ বলি শোন ঃ
তোমাদের আলম আছে বেঁচে ঘিরে খোদার নূরের মাঝে
তাহার প্রেমের অমিয় ধারা বর্ষিবে সকাল সাঝে।
মানস-পটের দূরসীমানায় চেয়ে দেখ ঐ নীলে,
ইলাহী নূরের তারকা উদিল হৃদয় গহিন তলে
বুলন্দ কর প্রিয় প্রভু তুমি শহীদের উজালা শানে
সালামতে রেখো তাঁর সকল আত্মীয়-স্বজনে।

- আবুল হাসান

শহীদ শাহ্ আলম স্মরণে

যুগে যুগে যারা আল্লাহ্‌র পথে, দিয়ে গেল নিজ প্রাণ
নিশ্চয় আজ খোদার দরবারে বিফল হয়নিকো জীবন দান।
রচি তাঁহারই গান,
ইতিহাস পাতে স্বর্ণ আখরে লিখা হবে যার নাম।
১৪২৪ (হিঃ), ৪ঠা রমযানের পবিত্র জুমুআর দিন,
রঘুনাথপুর বাগের শহীদ আলমের কেমনে শোধিব ঋণ।
হাসি-খুশী ভরা মায়া-মোহময় প্রীতি দিয়ে গড়া প্রভুর দান,
নিমিষের মাঝে জাহেল লোকেরা আজ করে দিল খান্- খান্।
ইমাম হিসেবে শাহ্ আলম ভাই আজ জুমুআর খুতবা দিল
বসি’ বসি’ সব মুসল্লিগণে মধুর খুতবা শুনিতেছিল।
রমযান হলো ধৈর্য ধারণ সিয়াম সাধনার মাস
সকল দিক থেকে ভূমি সম হৃদয় মোদের করিতে হবে যে চাষ।
গালি শুনেও শত্রু বিনাশ তরে অনেক দোয়া তোমরা কর,
বিপদ যতই আসুক না কেন খোদাকে তোমরা ধর।
খুতবার পরে গেল নিজ ঘরে সাথী ছিল তিনজন
বাইরে হঠাৎ শুনিতে পাওয়া গেল লোকদের গুঞ্জন।
হেনকালে হায় জাহেল লোকেরা ঘিরে নিল তাঁর বাড়ী
লাঠি সোটা হাতে আমিনুল শাহীনের মুখে রয়েছে যে দাড়ি।
যুদ্ধের সাজে আখেরী মোল্লা, হিংস্র হায়েনার মতো,
মোল্লা আমিনুল সামনে দাঁড়িয়ে, পিছে লোক শত শত।
বলিল হুংকারে, ‘কাদিয়ানী ছাড়, নইলে ছাড়াবো মোরা,
সমাজের সকলে মিলিয়া মিশিয়া করিব তোদের ‘এক ঘরা’
সাহসী শাহ্ আলম বলিল, ‘কেন ভাই? তোমাদের সমাধানের পথ এ কী?
তার চেয়ে এসো সকলে বসিয়া কুরআন-হাদীস খুলে দেখি।’
মোল্লার মাথা হয়ে গেল গরম বাধ মানে নাকো আর
লাঠি-সোটা নিয়ে বলিল হুংকারে, চুপ কর, খবরদার!
জাহেলী কায়দায় হিংস্র তান্ডব, ঘুষি আর লাঠালাঠি
পুরুষ-মহিলা-শিশু বাছ-বিচার নাই করিতেছে লাথালাথি।
আতিয়ার, বাশার, মণি আহত, লুটায়ে পড়িল শাহ্ আলম ভাই,
নারী শিশুগণে ডুকুরিয়া কাঁদে- হায়, হায়, হায়!
সবুজ শ্যামল, ছায়া বিথী বাগিচা, যেন করুণ স্বরে কাঁদে
মধ্য যুগীয় বর্বর হামলায় পড়েছে যেন আজ তারা ফাঁদে।
রক্তে ভেসে যায় আঙ্গিনা মেঝে রক্ত ছুটে হেথা সেথা
ডুকুরিয়া কাঁদে ভয়ে মরে ওরা, আর যে ভীষণ ব্যথা।
বাশার, আতিয়ারকে বেগম নাজমা ঠেলে নিরাপদে ঘরে,
শাহ্ আলম অধিক রক্তক্ষরণে যায় বুঝি যায় মরে।
আকাশ বাতাস উথলিয়া উঠে হাহাকার রবে ডাকি,
পশুর দলেরা করিতেছে কী আজ রমযানের রোযা রাখি।
শিশু-সন্তান মহিলাদের কান্নায় ভিজে যায় কোমল মাটি,
বড় যতনে এতদিন ধরে করে রেখেছিল ভাই যাহা খাঁটি।
যালেমরা শুধু মেরেই ছিল না, পথরোধ করেছিল তারা
এখানে সেখানে ছুটোছুটি করে বন্ধ করে দিয়েছিল গাড়ী ভাড়া।
কী বলিব ভাই মনে বড় ব্যথা, সবে করে হায় হায়!
হাসপাতালে নেওয়ার পথে শাহ্ আলম ভাই শহীদী স্বাদ পায়।
‘ইন্না লিল্লাহ’ পড়িল সকলে নয়নের জলে ভাসি,
শাহ্ আলম ভাইয়ের সোনার বদনে ঝলসে উঠছে যেন হাসি।
খবর পড়িল মোবাইল টেলিফোনে কেন্দ্রীয় আঞ্জুমানে
ছুটিয়া আসিল ন্যাশনাল আমীরের কাফেলা হৃদয়ের টানে টানে।
মোবাশ্‌শের উর রহমান ন্যাশনাল আমীর ও আওয়াল মাওলানা
আরো সফরের সঙ্গী ছিল যারা হয়ে গেল শোকে দেওয়ানা।
সকলের চোখে অশ্রু ঝরেছে বাধ মানে নাই আর
দোয়া ঠোঁটে তাদের রঘুনাথপুর বাগের খুলে গেল সকল দ্বার।
খবর পড়িল লন্ডনেতে ফিরোজ আলম মাওলানার কাছে
জরুরী করিয়া সে খবর তখনই হুযূর (আইঃ)-এর কাছে পৌছে।
হুযূর (আইঃ) শুনিয়া করিলেন দোয়া বাংলার শহীদের তরে
সকলে ছুটে যাও এক্ষুণি সেখানে শহীদ ভাইয়ের ঘরে।
ছুটিয়া আসিল কেন্দ্রীয় জামাত, আর আশ-পাশ যত জামাত ছিল
খুলনা, সুন্দরবন, উথলী ও যশোর সাথে এসে যোগ দিল।
সকলের চোখে অশ্রু বন্য বয়ে চলে যেন নদী
খোদা দেখেছেন করুণ এ চিত্র আসলে এরাই প্রকৃত দরদী।
সান্ত্বনা দেয় ন্যাশনাল আমীর সান্ত্বনা দেয় সবে,
ভাই শাহ্ আলমের শহীদ-এর কথা চির স্মরণীয় হয়ে রবে।
বাংলার ওরে সব দামাল ছেলেরা হও ত্বরা আগুয়ান
সকলে মিলিয়া এসো গাই মোরা শহীদের জয়গান।
যুগে যুগে যারা আল্লাহ্‌র পথে দিয়ে গেল নিজ প্রাণ
খোদার দরবারে নিশ্চয় আজ বাড়িয়া গিয়াছে তাদের মান-সম্মান।
ধর্মের পথে যারা নিহত বলিও না তারা মৃত
খোদার দরবারে হয়ে থাকে তারা অহরহ জীবিত।
ও ভাই আহমদী দেখেছ কি আজ শহীদ ভাইয়ের সাজ
শহীদ হয়ে সে আজকে মোদের বাড়িয়ে দিয়েছে কাজ।
জেগে ওঠ ভাই, জলদি চলো, সময় যে আর নাই
সকলে মিলে কাজের সুবাদে শহীদী গান গাই॥

- এনামুল হক রনি, মোয়াল্লেম

সংবাদ

কঠোর হতেই হবে

ধর্মীয় প্রসঙ্গ কখনোই রাষ্ট্রের ওপর চাপিয়ে দেয়া ঠিক নয়। এটা মানুষের সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার। রাষ্ট্রের দায়িত্ব, সকল নাগরিকদের নিরাপত্তা ও যার যার নিজস্ব বিশ্বাস অনুযায়ী ধর্ম পালনের অধিকার নিশ্চিত করা।

কিন্তু গত কিছুদিন যাবৎ বেশ কিছু লোকের একটা দাবী লক্ষ্য করা যাচ্ছে, দেশের কাদিয়ানি সম্প্রদায়ের ব্যাপারে সরকারকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। সর্বশেষ ৫ ডিসেম্বর তারা ঢাকায় জনসভা করে সরকারকে আলটিমেটাম দিয়েছে, ২৩ জানুয়ারির ভেতর কাদিয়ানি সম্প্রদায়কে অমুসলিম ঘোষণা করতে হবে। আর এ লক্ষ্যে তারা বেশ কিছু কর্মসূচি দিয়েছে।

কাদিয়ানি সম্প্রদায়কে অমুসলিম ঘোষণা করার দাবি করা হয়েছে সরকারের ওপর। সরকারের নীত-নির্ধারকরা এ ব্যাপারে সচেতন হবেন। কিন্তু এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে, কাদিয়ানিদের অমুসলিম ঘোষণার এ দাবির একটা দীর্ঘ অতীত রয়েছে। পাকিস্তান আমলে আমরা এ দাবি শুনেছি। এ উপলক্ষে তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যাপক কাদিয়ানি হত্যাযজ্ঞ হয়। এরপর তৎকালীন সরকার শক্ত হাতে এ দাবি যারা করছিল তাদেরকে দমন করে।

পরবর্তীকালে বাংলাদেশ হবার পর এরশাদের আমলেও ১৯৯১ পরবর্তী গণতান্ত্রিক সরকারের আমলে-এ দাবি বার বার দেখা যায়। এবং সেটা মুখচেনা ওই একটি বিশেষ শ্রেণীর কাছ থেকে।

তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের চরিত্রের মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। এই দেশের মানুষের চরিত্রের ভেতর কখনোই কট্টর কোনো কিছু প্রবেশ করানো যায় না। বরং এখানে উদারতা ও সহঅবস্থানের দিকটাই বড়।

বর্তমানে উদ্বেগের বিষয় হলো, মুখচেনা এ গ্রুপটি কাদিয়ানি সম্প্রদায়ের একটি মসজিদ ধ্বংস ও তাদের অমুসলিম ঘোষণার ব্যাপারে আলটিমেটাম দিয়েছে। তারিখ বেধে দিয়েছে। এক্ষেত্রে অবশ্যই সরকারকে বলা যায়, তারা যতো বড় কর্মসূচি দিক না কেন, তাতে ভীত হওয়া উচিত হবে না।

তাই সরকারের উচিত হবে, এখানে আইনকে নিজস্ব গতিতে চলতে দেয়া। অর্থাৎ রাষ্ট্রে সকলের অধিকার নিশ্চিত করা। সরকারের মনে রাখা উচিত হবে, বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ও জনগণের স্বার্থে কোনোরূপ কট্টরপন্থীকে নরম চোখে দেখার সুযোগ নেই। যারা এ চরিত্র নষ্ট করতে চায় তাদের প্রতি কঠোর হতেই হবে।

সৌজন্যে] প্রথম প্রকাশ : ১৯৮৪

যায়যায়দিন

বর্ষ ২০ সংখ্যা ০৯

ডিসেম্বর
০৯-১৫

আহমদীয়া প্রসঙ্গ

মুমিন-কাফের বিচারের অধিকার তাদের কে দিল?

গত কয়েক সপ্তাহ ধরে আহমদীয়া সম্প্রদায়কে ঘিরে কিছু গোষ্ঠী যে উত্তেজনা সৃষ্টি করে চলেছে, তা বড়ই দুর্ভাগ্যজনক। রাজধানীর নাখালপাড়ায় আহমদীদের একটি মসজিদ দখলের চেষ্টায় রাজধানীর বিভিন্ন এলাকা থেকে বাসে করে লোক জড়ো করা, লাঠিসোটা নিয়ে ও মসজিদ অভিমুখে জঙ্গি মিছিল এবং এসবে বাধাদানকারী পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে পুলিশসহ দেড় শতাধিক লোক আহত হওয়ার পর একটা গোষ্ঠী গত শুক্রবার দাবি করেছে যে সাত দিনের মধ্যে আহমদীয়াদের মুসলিম বা কাফের ঘোষণা করতে হবে।

প্রথমেই প্রশ্ন জাগে, কোনো ব্যক্তি বা সম্প্রদায়কে অমুসলিম বা কাফের ঘোষণার অধিকার আদৌ কি কারোর থাকতে পারে? খতমে নবুওয়াত আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ ও সমর্থকরা এই কর্তৃত্ব কোথায় পেলেন?

দ্বিতীয়ত, আহমদিয়াদের মসজিদ দখলের চেষ্টা করা, তাদের ওপর হামলা চালানো, পুরো সম্প্রদায়ের মানুষকে শঙ্কা, ভীতি, নিরাপত্তাহীনতায় নিক্ষেপ করা আইনের দৃষ্টিতে বড় ধরনের অপরাধ, যারা এসব তৎপরতা চালাচ্ছেন, তাদের মধ্যে বর্তমান জোট সরকারের শরিকের লোকজনও রয়েছেন। ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা করা যখন আমাদের রাষ্ট্রের অন্যতম মৌল নীতি আর সরকারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব, তখন এ ধরনের নেতিবাচক, শান্তি-সম্প্রীতি নষ্টকারী তৎপরতা সরকার উপেক্ষা করতে পারে না। শান্তি রক্ষা করা সরকারের দায়িত্ব।

তৃতীয়ত, আহমদিয়াদের অমুসলিম বা কাফের ঘোষণার দাবিতে যারা শান্তি ভঙ্গ করছেন, তাদের আচরণ ধর্মীয় বিবেচনায়ও অগ্রহণযোগ্য। যিনি আল্লাহ্ ও রাসূলে (সঃ) বিশ্বাস করে নিজেকে মুসলমান দাবি করেন তাকে অন্য একজন মুসলমান কি বলতে পারেন, 'আমি মুমিন, তুমি কাফের'? এমন ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ ইসলাম গ্রহণ করে না। তা ছাড়া, যে ইসলাম এত সহিষ্ণু ও গ্রহণক্ষম একটি ধর্ম যা অন্য জাতি-ধর্ম-বিশ্বাসের মানুষকেও সাদরে গ্রহণ করতে পারে, সেই ধর্মেরই একটি গোষ্ঠীকে কাফের ঘোষণার দাবিতে অশান্তি সৃষ্টি করা ইসলামের জন্য ক্ষতিকর আচরণ বৈ কিছু নয়। ইসলাম শান্তির ধর্ম, কোনো ব্যাপারেই বাড়াবাড়ির প্রতি সায় নেই ইসলামে।

আহমদিয়াদের অমুসলিম বা কাফের ঘোষণার অযৌক্তিক ও বেআইনী দাবি প্রত্যাহার করা হোক। কে মুমিন আর কে কাফের তা বিচারের ভার সবচেয়ে বড় বিচারকর্তার হাতে ছেড়ে দিয়েই নিশ্চিত থাকা যাক। যারা বেআইনি তৎপরতায় লিপ্ত হবেন, শান্তিশৃঙ্খলা ভঙ্গ করবেন, পবিত্র মসজিদে মারামারি করবেন, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ পদক্ষেপ নেয়া হবে- এই মর্মে সরকার এখনই তাদের সতর্ক করে দিক।

[সৌজন্যে] সম্পাদকীয় ঃ

প্রথম আলো

মঙ্গলবার ৯ ডিসেম্বর ২০০৩, ২৫ অগ্রহায়ণ ১৪১০

বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লাহ্‌র ২৬তম কেন্দ্রীয় সালানা ইজতেমা অনুষ্ঠিত

আল্লাহ্‌তাআলার অশেষ রহমতে বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লাহ্‌র ২দিনব্যাপী ২৬তম বার্ষিক ইজতেমা-২০০৩ গত ১০ ও ১১ অক্টোবর আহমদীয়া মুসলিম জামাতের কেন্দ্র দারুত তবলীগ কমপ্লেক্সে অনুষ্ঠিত হয়। ১০ অক্টোবর জাতীয় পতাকা ও আনসারুল্লাহ্‌র পতাকা উত্তোলন এবং আহাদ পাঠের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে ইজতেমার উদ্বোধন করা হয়। জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন হুযূর (আইঃ)-এর প্রতিনিধি ও মোহতরম ন্যাশনাল আমীর মোবাশ্‌শের উর রহমান এবং আনসারুল্লাহ্‌র মোহতরম সদর আহমদ তবশির চৌধুরী। এরপর উদ্বোধনী অধিবেশন শুরু হয়। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও নযম পাঠ করেন যথাক্রমে জনাব মসীহ্ উর রহমান ও জনাব ইব্রায়েতুল হাসান। ইজতেমা কমিটির চেয়ারম্যান জনাব আফজাল আহমদ খাদেম দুর্যোগের মধ্যে দূর-দূরান্ত থেকে কষ্ট করে আসার জন্য উপস্থিত সকল সদস্যদেরকে কৃতজ্ঞতা জানান এবং ইজতেমার বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের আহ্বান জানান।

২৬তম কেন্দ্রীয় বার্ষিক ইজতেমা-২০০৩
26TH ANNUAL IJTEMA-2003
মজলিসে আনসারুল্লাহ্, বাংলাদেশ
MAJLIS-E- ANSARULLAH, BANGLADESH
১০ও১১ অক্টোবর
10 & 11 OCTOBER

ইজতেমায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভাষণ দিচ্ছেন জনাব আহমদ তবশির চৌধুরী, সদর মজলিসে আনসারুল্লাহ্, বাংলাদেশ। মঞ্চে উপবিষ্ট বাম থেকে জনাব আফজাল আহমদ খাদেম, নায়েব সদর আউয়াল এবং চেয়ারম্যান ইজতেমা কমিটি, হুযূর (আইঃ)-এর বিশেষ প্রতিনিধি ও ন্যাশনাল আমীর মোহতরম মোবাশ্‌শের উর রহমান এবং জনাব কওসার আলী মোল্লা, সেক্রেটার ইজতেমা কমিটি।

হুযূর (আইঃ)-এর প্রতিনিধি মোহতরম মোবাশ্‌শের উর রহমান তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে আনসারুল্লাহ্‌র দায়িত্ব ও কর্তব্যের প্রতি উপস্থিত সদস্যদের মনোযোগ আকর্ষণ করেন এবং তাদের নিজেদের পরিশুদ্ধ করে আনসারদের উন্নতিতে সহায়ক ভূমিকা পালনের জন্য আহ্বান জানান। সভায় কায়েদ উমুমী মোহাম্মদ মাহবুব আজম রেজা সাধারণ বিষয়াবলীর ওপর এবং কায়েদ মাল মসীহ্ উর রহমান আর্থিক বিষয়ক রিপোর্ট পেশ করেন। সভার শেষ পর্যায়ে বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লাহ্‌র মোহতরম সদর আহমদ তবশির চৌধুরী তাঁর বক্তব্যে কুরআন মাজীদ শিক্ষার বিষয়ে আন্তরিকভাবে কাজ করার জন্য উপস্থিত সকলের প্রতি আহ্বান জানান। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর বিভিন্ন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বৃষ্টির জন্য মাঠের খেলাধূলা প্রতিযোগিতার সময় পরিবর্তন করা হয়। মোট ১২টি বিষয়ে প্রতিযোগিতা হয়। খোদার ফযলে এবার প্রতিযোগি বেশি হওয়ার কারণে অনেক রাত পর্যন্ত প্রতিযোগিতা চলে। তবু কারো আগ্রহের কোন কম্‌তি ছিল না, আল্‌হামদুলিল্লাহ্।

১১ অক্টোবর সমাপ্তি অধিবেশনে হুযূর (আইঃ)- এর প্রতিনিধি মোহতরম ন্যাশনাল আমীর প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। এবার পুরস্কারের বিশেষ দিক ছিল মজলিসের কাজের জন্য পুরস্কার বৃদ্ধি। এ সব বিষয়ে পুরস্কার পায় (১) শ্রেষ্ঠ রিজিওনাল মজলিস-খুলনা (২) শ্রেষ্ঠ জেলা মজলিস - বগুড়া (৩) শ্রেষ্ঠ মজলিস - চট্টগ্রাম।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ সত্ত্বেও আনসারদের উপস্থিতি মোটামুটি ভাল। মোট রেজিষ্ট্রেশন হয় ২০১ জন। মোট যোগদানকারী মজলিসের সংখ্যা ৪৯টি। আজ পর্যন্ত এটাই সবচেয়ে বেশি উপস্থিতি।

- কওসার আলী মোল্লা
সদস্য সচিব, ২৬তম ইজতেমা কমিটি
মজলিসে আনসারুল্লাহ্, বাংলাদেশ

সন্তান লাভ

মহান আল্লাহ্‌তাআলার তাঁর অশেষ মেহেরবানীতে গত ২৯/৯/০৩ইং তারিখে আমাদিগকে এক কন্যা সন্তান দান করেছেন, আল্‌হামদুলিল্লাহ্। নবজাতিকা যথাক্রমে সরাইলের মীর মোহাম্মদ সাফি ও চট্টগ্রামের মেজর (অবঃ) আসাদুজ্জামান সাহেবের নাতনী ও দৌহিত্রী। নবজাতিকার আধ্যাত্মিক উন্নতি ও শারীরিক সুস্থতার জন্য সকলের নিকট দোয়ার আবেদন করছি। হুযুর (আইঃ)-এর নিকট দোয়া ও নামের জন্য আবেদন করলে তিনি নবজাতিকার নাম রাখেন আমাতুল মুসাবভীর (Amatul Musawir)

মীর ওয়াজেদ আলী ও
আমাতুস সালাম তামান্না

সৈয়্যদনা হযরত আকদস মির্যা
তাহের আহমদ খলীফাতুল মসীহ্
রাবে' (রাহেঃ)-এর পবিত্র
খেলাফত কালীন শেষ তাহ্‌রীক
গরীব কন্যাদের সম্মানের সাথে
বিদায়ের জন্যে

মরিয়ম সাদী ফান্ড

আপনি কি এতে অংশ নিয়েছেন। যদি না নিয়ে থাকেন তাহলে আজই আপনি জামাতের সেক্রেটারী মালের সাথে যোগাযোগ করুন। জাযাকুমুল্লাহ্।

-নায়েব বায়তুল মাল

সংশোধনী

পাঠকদেরকে নিম্নলিখিত সংশোধনী নোট করে নেয়ার জন্যে অনুরোধ করা যাচ্ছে। অনবধানবশতঃ মুদ্রণজনিত কারণে পাঠক-পাঠিকাদের অসুবিধা হওয়ায় আমরা দুঃখিত।

- নির্বাহী সম্পাদক

সংখ্যা	পৃষ্ঠা	কলাম	লাইন	ভুল	শুদ্ধ
৩১-১০-০৩	সম্পাদকীয়	২	১০	'দিনের ...... থাকে'	'দিনের ...... থেকে'
১৫-১১-০৩	১৪ পৃষ্ঠা	শিরোনাম	২	২৫-০৫-০৩	২৫-০৩-০৩

TRUST THE LOGO

CALL CONCORD

CONCORD CONDOMINIUM LTD.

CONCORD CENTRE 43, NORTH GULSHAN C/A, DHAKA-1212

Tel : 8824724, 8812220, 8824076, Email-mhk@bdmail.net Fax : 880-2-8823552

Kh. Imteeaz Uddin Nayeem ITP

Tax Consultant

Golden View Consultancy Services

(A house of Consultants on Accounts, Income Tax, VAT & Company Affairs)

Business Solution :

- Accounting Work
- Taxation
- Company Affairs
- VAT & Custom Duty
- Work Permit.

Address :

Khan Mansion (9th Floor)
107, Motijheel C/A, Dhaka
Phone : 8128812
Mobile : 019344688

স্বাচ্ছন্দ্য ও মনোরম পরিবেশে স্বাদে ভরপুর রুচিকর
খাবার পরিবেশনে অনন্য

ধানসিঁড়ি খাবার

ধানমন্ডি অর্কিড প্লাজা (রূপা প্লাজার পার্শ্বে)
ফোন ঃ ৯১৩৬৭২২

সূচনা রেন্ট-এ-কার

যে কোন স্থানে যে কোন সময়ে ট্রিপের জন্য যোগাযোগ করুন ঃ

সালমান

৬৭৬/৩২ ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা
ফোন ঃ ৯১১৮৭৪৯

পাক্ষিক আহমদীর
অব্যাহত অগ্রযাত্রায়
আমাদের
অভিনন্দন

FIAT
FUJICOLOR
COLOR

PRODUCER OF QUALITY NEON SIGN, BELL SIGN, PLASTIC SIGN, HOARDINGS, GIFT ITEMS ETC.

AIR-RAFI & CO.

120/32 Shajahanpur, Dhaka-1217
Phone : 414550, 9331306

New Vo. No. 66 ◆11th Issue
December 15, 2003 ◆Tk. 10.00

Fortnightly
The AHMADI
রেজিঃ নং-ডি, এ-১২

لا اله الا الله محمد رسول الله

Muslim TV AHMADIYYA International

এমটিএ একটি ঐশী নিয়ামত। আপনার বাড়ীতে এমটিএ-র সংযোগ নিন, নিজের পরিবারকে অবক্ষয় মুক্ত রাখুন।

প্রত্যেক স্থানীয় জামাতের আমীর কিংবা প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব খিলাফতের সাথে নিজের সম্পর্ক আরো মজবুত করার লক্ষ্যে নিজ নিজ জামাতে বেশি বেশি **MTA**-র সংযোগ নিন।

- প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যা ৭টায় হুযূর (আইঃ)-এর জুমুআর খুতবা সরাসরি সম্প্রচার
- প্রতিদিন রাত ৮টায় বাংলা সম্প্রচার

ASIASAT 2

এশিয়ার অন্যতম জনপ্রিয় স্যাটেলাইটে **এমটিএ** দেখার সুযোগ গ্রহণ করুন।

DISH POSITION 100.5° EAST
FREQ. - 3660
S.R - 27500
POL - VERTICAL

বিস্তারিত তথ্যের জন্যে যোগাযোগ করুন ঃ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

৪ বক্শী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

Printed and Published by Muhammad F. K. Molla at Ahmadiyya Art Press, 4, Bakshi Bazar Road,
Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jamaat, Bangladesh.
Editor in Charge : Maulana Ahmad Sadeque Mahmood, Executive Editor : Mohammad Mutiur Rahman
Phone : 7300808, 7300849 Fax : 880-2-7300925 E-mail : amgb@bol-online.com